প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

ইতিহাসের গল্প

ইতিহাসের গল্প

ইতিহাসের গল্প

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

টাবলু, টিয়া ও এলাকে

সূচীপত্র

তিনশো বছর আগের কলকাতা

প্রায় তিনশো বছর আগে। ১৬৯০ সালের বর্ষাকাল। কয়েকটি ছোট-বড় জাহাজ পূর্বদিক থেকে এসে সুতানুটি গ্রামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সুতানুটি এখনকার কলকাতা শহরের উত্তর দিকে। এখন যে-জায়গাকে বলে মদনমোহনতলা, তার কাছাকাছি। জাহাজগুলির একটিতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির গোরা সৈন্য, সৈন্যদের কর্তা ক্যাপ্টেন ব্রুক। তাছাড়া কোম্পানির ব্যবসার কর্তা জোব চার্নক। এঁরা নিজেদের ইচ্ছায় এই অঞ্চলে আসছিলেন না। ইংরাজদের তখনও রাজত্ব করবার স্বপ্ন ছিল না। যা ছিল, তা হল চট্টগ্রামে কুঠি তৈরি করে ব্যবসা করবার ইচ্ছা। সেখানে মোগল সেনাপতির হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে তারা সুতানুটির কাছে আশ্রয় খুঁজছিল। ২৪ আগস্ট দুপুরবেলায় নৌকাগুলি সুতানুটিতে এসে পৌঁছল। এ-জায়গা ইংরাজদের একেবারে অজানা ছিল না। আগেও তারা এসে ওখানে কিছুদিনের জন্য ছিল। স্থায়ীভাবে থাকবে, এ কথা কখনো ভাবেনি। জোব চার্নক এদেশে প্রথম এসেছিলেন পঁয়ত্রিশ বছর আগে। দু' বছর আগে মাদ্রাজে ছিলেন। পরে আবার বাংলায় এলেন। কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জোব চার্নক আরও তিন বছর বেঁচে ছিলেন। এর মধ্যে ইংরাজদের ভাগ্যের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। শুধু সুতানুটি নয়,

সুতানুটি, কলিকাতা, গোবিন্দপুর—তিন গ্রামে তাদের আধিপত্য। সুতানুটি নাম দেখেই মনে হয় এটি তাঁতিদের গ্রাম। এখনকার হাটখোলা অঞ্চলকে মোটামুটি বলা চলে তখনকার সুতানুটি। তার দক্ষিণে কলিকাতা এখনকার ডালহৌসি স্কোয়ার বা বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ। তার পশ্চিম দিকে তখন ছিল ফোর্ট উইলিয়ম। আরও দক্ষিণে এসে গোবিন্দপুর ; অনেকটা তার জঙ্গল, আদি গঙ্গা বা টালির নালা পর্যন্ত চলে গিয়েছে। চোর-ডাকাতদের থাকবার জায়গা। এখনকার ময়দান তখন বড়-বড় গাছের জঙ্গল। তার ভিতর দিয়ে সরু পথ কালীঘাট মন্দিরে যাবার জন্য। ডাকাতের ভয়ে সে-রাস্তায় তীর্থযাত্রীদের যাওয়া সহজ ছিল না। বহু দিন পর্যন্ত চোর-ডাকাতদের ভয় ছিল। অনেক বছর পরে যখন এসপ্ল্যানেডের কাছে দু'তিনটি করে বাড়ি উঠতে আরম্ভ করল, তখনও ভয় যায়নি। সেখানে যারা কাজ্কর্ম করত, তারা রাত্রে বাড়ি ফিরবার সময় ভাল কাপড় কি দামি জিনিস রেখে যেত। সঙ্গে নিয়ে যেতে সাহস পেত না, পাছে কেউ কেড়ে নিয়ে যায়।

জোব চার্নক ১৬৯৩ সালে মারা যান। তখন সুতানুটি বেশ বর্ধিষ্ণু জায়গা হয়ে উঠেছে। কয়েক বছরের মধ্যে দুটি ঘটনা ঘটল। একটি বর্ধমানের একজন বড় জমিদার শোভা সিংহের বিদ্রোহ। ইংরাজরা নবাবকে জানাল, এই রকম বিদ্রোহ ঘটতে থাকলে তাদের ব্যবসাবাণিজ্যের সর্বনাশ হবে। কাজেই তাদের কুঠিবাড়ি ইত্যাদি সুরক্ষিত করতে দেওয়া হোক। বিদেশী বণিকদের বাণিজ্য যদি চলতে না পারে তাহলে নবাবেরও ক্ষতি। তাঁর শুল্কের টাকা কম পড়ে যাবে। আরজি মঞ্জুর করা হল। কিন্তু ইংরাজরা তাদের কুঠি ইত্যাদি সুরক্ষিত করার নামে একটি দুর্গ গড়ে তুলল। নাম দিল ইংলণ্ডের তখনকার রাজা উইলিয়মের নামে 'ফোর্ট উইলিয়ম'। এই দুর্গ কোথায় ছিল ? এখন যেখানে জেনারেল পোস্ট আপিস, সেখান থেকে আরম্ভ করে ফেয়ার্লি প্লেসে রেলের বুকিং আপিস, সবই ছিল

এই দুর্গের মধ্যে। পশ্চিমে হুগলি নদী। উত্তর দিকে দুর্গের প্রাচীর কতদূর গিয়েছিল, চেষ্টা করলেই জানতে পারবে। লর্ড কার্জন ফুটপাথের উপরে প্রায় আধ ইঞ্চি চওড়া লম্বা সোনালি দাগ টেনে দিয়েছিলেন। পঁচিশ বছর আগেও তার বিবর্ণ চেহারা দেখেছি। ধুলো কাদা, নর্দমার জল, পানের পিকের তলায় লক্ষ করলে এখনও সে দাগ দেখতে পাওয়া যাবে। এখন যে ফোর্ট উইলিয়ম দেখা যায় ময়দানের পশ্চিম দিকে, সে পরে তৈরি হয়েছিল ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি জাঁকিয়ে বসল বটে, কিন্তু নানা রকম অসুবিধা দেখা দিতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ঠিক করা হল কোম্পানির পক্ষ থেকে একটি ছোট দল দিল্লিতে গিয়ে বাদশার সঙ্গে দেখা করবেন। তখন সম্রাট আওরঙ্গজেব গত হয়েছেন। তাঁর নাতি ফরুখ্‌শিয়ার দিল্লির বাদশা। সঙ্গে অনেক দামি উপহার নিয়ে দলটি তো দিল্লি গিয়ে পৌঁছল। তখন বাদশার বিয়ের কথা হচ্ছে। তিনি এক রাজপুত রাজার মেয়েকে বিয়ে করবেন। বিয়ের আগে কাজের কথা হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। ইংরাজদের দলটি দিল্লিতে বসে রইল, কবে সম্রাটের বিয়ে হবে সেই দিন চেয়ে। কিন্তু বিয়েতেও অসুবিধা। ফরুখ্‌শিয়ার অসুখে পড়লেন। দিন পিছিয়ে যেতে লাগল। কোনো হাকিম সম্রাটের অসুখ সারাতে পারলেন না। অবশেষে দরবারের সবাই ভাবলেন ইংরাজদের দলে তো একজন ডাক্তার রয়েছেন, ডাক্তার হ্যামিলটন। হাকিমদের দিয়ে না হলে একবার বিলিতি ডাক্তারের দৌড় দেখা যাক। আশ্চর্য ব্যাপার! যে অসুখ কেউ সারাতে পারছিল না, ডাক্তার হ্যামিলটন তা সারিয়ে দিলেন। খুশি হয়ে ফরুখ্‌শিয়ার ইংরাজদের কলকাতার কাছে চব্বিশটি গ্রামের জমিদারি বখশিস করলেন। এই চল চব্বিশ পরগনা।

১৭৪০ সালে আলিবর্দি খাঁ বাংলা বিহার ওড়িশার নবাব হলেন।

তিনি বুদ্ধিমান নবাব ছিলেন। কিন্তু তাঁর সময় এ-রাজ্যে এক বড় বিপদ দেখা দিল। নাগপুর থেকে মারাঠারা এসে বাংলাদেশ আক্রমণ করল। তাদের রাজা ছিলেন রঘুজি ভোঁসলা। তিনি অবশ্য আসেননি, তাঁর সেনাপতি ভাস্কর রামকে (ভাস্কর পণ্ডিত) পাঠিয়েছিলেন। এই সময়কার একজন কবি মারাঠা সৈন্যদের কথা লিখেছিলেন :

লুঠি বাঙ্গালার লোক করিল কাঙাল
গঙ্গাপার হইল বাঁধি নৌকার জাঙাল ৷৷

নৌকা দিয়ে পোল তৈরি করে মারাঠারা মুর্শিদাবাদ গিয়েছিল। সেখানে ধনী জগৎশেঠের বাড়ি লুঠ করেছিল। লোকে বলত অন্তত আড়াই কোটি টাকা সেখান থেকে মারাঠারা পেয়েছিল। বর্গির হাঙ্গামায় বাংলা ছারখার হয়েছিল, কিন্তু বর্গিরা গঙ্গাপার হয়ে কলকাতা আক্রমণ করেনি। নদীর ধারে ইংরাজদের কামান সাজানো। তারা বুঝতে পেরেছিল নৌকায় কলকাতায় আসবার চেষ্টা করলে তোপের মুখে তাদের সর্বনাশ হবে। বর্গিরা কলকাতায় এল না বটে, কিন্তু শহরের লোকদের ভয়ের অবধি ছিল না। মারাঠারা ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করতে আসত। তাদের অশ্বারোহী আটকাবার জন্য শহরের ধনী ব্যবসায়ীরা চাঁদা তুলে কলকাতার চারদিকে খাল খুঁড়তে আরম্ভ করেছিলেন। তাঁদের ইচ্ছা ছিল গঙ্গা থেকে খাল কেটে সমস্ত শহরকে ঘিরে ফেলা হবে, শত্রুর ঘোড়া ঢুকতে পারবে না। এই খাল কাটা শেষ হয়নি। উত্তরে শহর পরিক্রমা করে এই খাল এখনকার এণ্টালি বাজারের কাছাকাছি এসে বন্ধ হয়ে যায়। ইতিমধ্যে ভাস্কর পণ্ডিতের মৃত্যু হল। আলিবর্দি তাঁর সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে সভায় ডেকে এনে তাঁকে খুন করালেন। মারাঠারা দেশে ফিরে গেল।

মারাঠারা কলকাতায় এল না। গঙ্গার পশ্চিমে ব্যবসার বড় জায়গা ছিল। সেই সব জায়গা থেকে ব্যবসায়ীরা অনেকে এসে কলকাতায়

জড়ো হতে লাগলেন। ইংরাজদের কামানের আশ্রয়ে কলকাতা তখন নিরাপদ জায়গা। এই সব কারণে ইংরাজদের নামডাক বেড়ে গেল। কলকাতা শহরও বাড়তে লাগল।

কয়েক বছর পরে অন্য দিক থেকে ইংরাজদের বিপদ দেখা দিল। বুড়ো নবাব আলিবর্দি মারা গেলেন। তখন ১৭৫৬ সাল। তার পর নবাব হলেন তাঁর মেয়ের ছেলে সিরাজউদ্দৌলা। বছর কুড়ি বয়স। সাহসের অভাব ছিল না, কিন্তু অন্য দোষ ছিল। তাছাড়া রাজনীতি যে ভাল বুঝতেন, তা নয়। তিনি নবাব হবার কিছুদিন পরে ইংরাজদের সঙ্গে তাঁর কলহ আরম্ভ হল। তার একটি কারণ হল কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ ইংরাজরা আরও সুদৃঢ় করেছিলেন। চন্দননগরে ফরাসিদের দুর্গ ফোর্ট অরলেয়াঁকেও মজবুত করা হচ্ছিল। নবাব দু' পক্ষকেই লিখলেন যে, তাদের কাজ খুব বেআইনি হয়েছে। দুর্গে যেসব পরিবর্তন করা হয়েছে, তা ভেঙে ফেলে দিতে হবে। ফরাসিরা ভালমানুষের মতো চিঠি লিখল যে, নবাব ভুল শুনেছেন, তারা সামান্য মেরামত করেছে মাত্র। ইংরাজদের জবাব ছিল অন্য রকম। তাদের বক্তব্য, দিনকাল খারাপ, চারদিকে বিশৃঙ্খলা, শক্তি বাড়ানো ছাড়া তাদের উপায় নেই। এই উত্তরে নবাব খুশি হলেন না। জুন মাসে তিনি অনেক সৈন্য নিয়ে কলকাতা আক্রমণ করলেন। ইংরাজরা পিছু হটতে হটতে দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নিল। নবাব তখন দুর্গের চারদিক ঘিরে আক্রমণ চালাতে লাগলেন। ইংরাজদের পক্ষে তাঁকে ঠেকানো সম্ভব ছিল না। তাদের কেউ কেউ দুর্গের পশ্চিম দিক দিয়ে হুগলি নদীর দিকে নৌকা করে পালিয়ে গেল।

দুর্গ অধিকার করে সন্ধ্যার সময় ইংরাজ বন্দীদের একটি ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল। তখন খুব গরমের সময়। ১৪৬ জন বন্দী। পরদিন সকালে দরজা খুলে দেখা গেল কেবল ২৩ জন বেঁচে আছে। একে 'অন্ধকূপ হত্যা' বলে। এই ঘটনা কি সত্যি ? পণ্ডিতরা

এ নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। কিন্তু এই কাহিনী একেবারে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। হলওয়েল সাহেব ছিলেন বন্দীদের মধ্যে একজন। তিনি এই ঘটনার দীর্ঘ বিবরণ লিখেছেন। হলওয়েলের অবশ্য মিথ্যাবাদী বলে দুর্নাম ছিল। তাছাড়া তিনি ঘটনাটিকে অনেক বাড়িয়ে লিখেছিলেন, কাজেই তাঁর কথা সহজে বিশ্বাস করায় অসুবিধা ছিল। বন্দী অবস্থায় মৃত বলে যত লোকের নাম হলওয়েল করেছিলেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ যুদ্ধে মারা গিয়েছিল এ কথা অবশ্য প্রমাণ করা সহজ হবে না। কিন্তু চন্দননগরের ফরাসিরা ও হুগলির ওলন্দাজরা তখনই তাদের বড় আপিসকে লিখে জানিয়েছিল যে, কলকাতায় অবরোধের সময় ভয়ঙ্কর কাণ্ড হয়েছে। অনেক ইংরাজ ঘরে বন্দী অবস্থায় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা গিয়েছে। এসব কথা একসঙ্গে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ফরাসিরা তো ইংরাজদের চিরকালের শত্রু। ওলন্দাজরাও ইংরাজদের বন্ধু ছিল না। কিন্তু তারাও এই কথা বলে গিয়েছে।

এই বিপদের পরে, ইংরাজ বন্দীদের যখন মুক্তি দেওয়া হল, তখন তারা দক্ষিণে হুগলি নদীর ধারে ফলতা গ্রামে গিয়ে বাস করতে লাগল। এই খবর যখন মাদ্রাজে পৌঁছল, তখন মাদ্রাজ সরকার কলকাতায় ইংরাজদের সাহায্যের জন্য ক্যাপ্টেন ক্লাইভ ও একজন নৌসেনাপতি অ্যাডমিরাল ওয়াটসনকে যুদ্ধের জাহাজ ও সৈন্য দিয়ে ফলতায় পাঠিয়ে দিলেন। তাদের সাহায্যে ইংরাজরা কলকাতা অধিকার করল। তার অল্প কয়েকদিনের মধ্যে দ্রুত বদলে যেতে লাগল বাংলার ইতিহাসের ধারা।

নতুন কলকাতার সূচনা

ইংরাজরা এসে তো কলকাতা অধিকার করল। বেশি বাধা হল না। এই খবর শুনে সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা দখল করতে এগিয়ে এলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডের উপরে, এখন যেখানে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বাড়ি, তার কাছে এসে তাঁবু ফেললেন। তখন কলকাতার চেহারা অন্যরকম। নবাব যেখানে ছাউনি করলেন, তার চারদিকে ঝোপ জঙ্গল জল কাদা। একেবারে বাদার মতো চেহারা। একটা সরু রাস্তা দিয়ে তাঁর তাঁবুর কাছে পৌঁছানো যেত। তার দু'দিকে নিচু জায়গা,ধানের চাষ হত। ক্লাইভ ঠিক করলেন শেষ রাত্রে কামান নিয়ে গিয়ে নবাবকে আক্রমণ করবেন। ক্লাইভ সব সময় রাত্রে আক্রমণ কিংবা যুদ্ধ পছন্দ করতেন। এর আগে তিনি মাদ্রাজে ছিলেন, তখন তিনি এ-রকম করেছেন। এবার তাঁর সে ফন্দি খাটল না। তখন শীতকাল। শেষ রাত্রে যাত্রা শুরু করে ক্লাইভ যখন নবাবের তাঁবুর কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছলেন, তখনও অন্ধকার কাটেনি। চারদিকে কুয়াশা। ক্লাইভের লোকজন অন্ধকারে কিছু না দেখতে পেয়ে কামানের গাড়িটাড়ি নিয়ে ভুল করে রাস্তার পাশে নিচু জমিতে গিয়ে পড়ল। খুব হৈচৈ চেঁচামেচি হল। নবাবের শিবিরে লোকজন জেগে উঠল। ক্লাইভের সৈন্যরা একটু সামলে উঠে কামান ছুঁড়তে

লাগল। নবাবের শিবির থেকেও কামানের গোলা আসতে লাগল। ক্লাইভ যা ভেবেছিলেন তা হল না। নিরাশ হয়ে ক্লাইভ ফোর্ট উইলিয়মে ফিরে এলেন। তখন সকাল হয়েছে। কুয়াশা কেটে রোদ উঠেছে।

আরও কিছুদিন পরে মুর্শিদাবাদে ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া যেতে লাগল। সিরাজউদ্দৌলাকে ইংরাজরা পছন্দ করত না। সিরাজউদ্দৌলাও ইংরাজদের দেখতে পারতেন না। আর কেউ কেউ ছিলেন, যাঁরা চেয়েছিলেন সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসন থেকে সরানো হোক। এর পরিণতি কী হতে পারে তা তাঁরা হয়তো ভেবে দেখেননি। এই দলে প্রধান ছিলেন বিখ্যাত ধনী জগৎশেঠের পরিবার। কিন্তু নবাবকে সরাতে হলে আর-একজনকে নবাব করতে হবে। সে লোক কোথায় ? শেঠরা ইয়ার লতিফ খাঁর নাম করলেন। ইয়ার লতিফ খাঁ একজন সাধারণ সামরিক কর্মচারী, শেঠদের হাতের লোক। ইংরাজরা তাঁকে পছন্দ করত না। আরও দু'একটি নাম হয়েছিল, কিন্তু ইংরাজরা আগ্রহ দেখালেন না। তারপরে একসময় নাম হল মিরজাফরের। তখন ইংরাজদের মনে হল এতক্ষণে ঠিক লোক পাওয়া গিয়েছে। মিরজাফর আলিবর্দির বোনকে বিয়ে করেছিলেন। এক সময় ভাল সেনাপতি হিসাবে তাঁর নামও ছিল। কিন্তু তখন তাঁর বয়স হয়ে গিয়েছে। তা-ছাড়া বহুদিনের আফিং খাওয়ার অভ্যাসের ফলে তাঁর মানসিক বা শারীরিক শক্তি কিছুই নেই। তাহলেও তাঁকে ইংরাজরা মেনে নেবে, এটাও পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল। নবাব হলে ইংরাজদের অনেক টাকাকড়ি ঐশ্বর্য উপহার দেবেন বলে মিরজাফরও প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু বিপদ হল একজনকে নিয়ে। সে উমিচাঁদ, একজন বড় ব্যবসায়ী। খুব ধূর্ত লোক। সে ঘটনার আঁচ পেয়েছিল। সে ইংরাজদের বলল, তাকে টাকাপয়সা দিয়ে খুশি না করলে সে নবাবকে গুপ্ত ষড়যন্ত্রের সব কথা বলে দেবে। এর ফল কী হবে তা বুঝতে কারুর বাকী ছিল না।

জোব চার্নক

সিরাজউদ্দৌলা

রবার্ট ক্লাইভ

ওয়ারেন হেস্টিংস

দ্বিতীয় বাজীরাও

ক্লাইভও এক ফন্দি করলেন। দুটি দলিল তৈরি করা হল। একটিতে উমিচাঁদ যে রকম চেয়েছিল, সে রকম লেখা হল, আর একটিতে উমিচাঁদের পাওনার কোনও উল্লেখ থাকল না।

ইতিমধ্যে নবাব আর ক্লাইভের মধ্যে চিঠি চালাচালি হচ্ছিল। কেউ কাউকে বিশ্বাস করছিলেন না। কিন্তু প্রত্যেকেই মনের ভাব যথাসম্ভব গোপন করবার চেষ্টা করছিলেন। স্ক্র্যাফ্‌ট্‌ন নামে ক্লাইভের এক বন্ধু মুর্শিদাবাদে গিয়ে নবাবের সঙ্গে দেখা করলেন। নবাবকে বোঝাতে চাইলেন ইংরাজদের কোনও মন্দ অভিপ্রায় নেই। মিরজাফরকে সিরাজউদ্দৌলা খুব সন্দেহের চোখে দেখতে আরম্ভ করেছিলেন। মিরজাফরের সঙ্গে কী করে ইংরাজদের গোপনে দেখা হবে, সেটা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। অবশেষে কোম্পানির ওয়াটস সাহেব ঘেরাটোপ দেওয়া পালকি চড়ে মিরজাফরের বাড়িতে গিয়ে দেখা করলেন। এ-রকম পালকিতে মেয়েরাই যাতায়াত করতেন, রক্ষীরা কিছু সন্দেহ করল না। পালকি একেবারে মিরজাফরের অন্দরমহলে গিয়ে থামল। সেখানে মিরজাফর আর তাঁর ছেলে মিরন তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন।

ওয়াটস মিরজাফরের সামনে সন্ধিপত্র খুলে ধরলেন। মিরজাফর এক হাতে কোরান ছুঁয়ে থাকলেন, অন্য হাতে ছেলের মাথায় রেখে শপথ করলেন, তিনি ইংরাজদের সঙ্গে প্রতিজ্ঞা ভাঙবেন না।

যুদ্ধের প্রস্তুতি ঠিক হয়ে গেল। হুগলির কাছে কালনায় ইংরাজ সৈন্য এসে জড় হল। ওয়াটস মুর্শিদাবাদ থেকে পালিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। এর পরের ঘটনা খুব তাড়াতাড়ি ঘটতে লাগল। মিরজাফরের ব্যবহার দেখে ক্লাইভেরও সন্দেহ হচ্ছিল, তিনি দু'কূল বজায় রেখে চলবার চেষ্টা করছেন। শেষ পর্যন্ত মিরজাফর তাঁর এক কর্মচারীকে জানালেন, তিনি ঈদের পরে ইংরাজদের সঙ্গে যোগ দেবেন। সে কথা তিনি 'কর্নেল সাহেব'কে অর্থাৎ কর্নেল ক্লাইভকে যেন জানিয়ে দেন। চিঠিটা খুব গোপনীয়। জুতোর মধ্যে সেলাই

করে পাঠানো হচ্ছে।

ক্লাইভ মিরজাফরের কথার উপর বিশ্বাস রাখতে পারছিলেন না। মিরজাফরের অবস্থাও সেই রকম। যাই হোক, অবশেষে নবাব তাঁর ফৌজ নিয়ে ২১শে জুন দাউদপুর গ্রামে এসে পৌঁছলেন। গ্রামের কাছে নবাবের সৈন্যরা শিবির স্থাপন করেছিলেন। পলাশি, যেখানে যুদ্ধ হয়েছিল, সে-জায়গা এখান থেকে বেশি দূরে নয়। নবাবের সঙ্গে ছিল পদাতিক ও অশ্বারোহী মিলিয়ে পঞ্চাশ হাজারের বেশি লোক। তা ছাড়া পঞ্চাশটির বেশি বড় কামান। ইংরাজদের সৈন্য অনেক কম। তাহলে কী হবে ? সিরাজউদ্দৌলা সেনাপতিদের মধ্যে প্রায় কাউকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। মিরজাফর তখনও দু'দিক রাখবার চেষ্টা করছিলেন। ২৩শে জুন সকালে ক্লাইভ মিরজাফরকে লিখলেন, তাঁর পক্ষে যতটা করা সম্ভব তিনি করেছেন। এর পরেও যদি মিরজাফর তাঁর সঙ্গে এসে মিলিত না হন, তাহলে তিনি নবাবের সঙ্গে গোলমাল মিটিয়ে ফেলবেন।

এই চিঠি লেখার ঘণ্টাখানেক পরে সকাল আটটা নাগাদ নবাবের ছাউনি থেকে বড় বড় গোলা ইংরাজ শিবিরে এসে পড়তে লাগল। প্রায় চার ঘন্টা ধরে এই রকম চলল। ইংরাজরা ভাল করে গোলাবর্ষণের জবাব দিতে পারলেন না। তারপরে আধঘণ্টা ধরে প্রবল বৃষ্টি। বৃষ্টির সময় গোলাবর্ষণ বন্ধ ছিল। বৃষ্টির পর আবার শুরু হল।

ক্লাইভ এ সময় কোথায় ছিলেন ? বৃষ্টির সময় মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভিজে গিয়েছিলেন। ইংরাজদের যেখানে শিবির, সেখানে একটি পাকা বাড়ি ছিল। তিনি সেই বাড়িতে ঢুকে জামাকাপড় বদলে শুয়ে পড়লেন। একটু ঘুমিয়েও পড়েছিলেন। তাঁর নির্দেশ ছিল, এখন এই রকম চলুক। রাত্রে যুদ্ধ করা যাবে।

ইতিমধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছিল। নবাবের সেনাপতি মির মদন গুরুতর আহত হয়েছিলেন। তাঁকে নবাবের

কাছে নিয়ে আসা হল। সেখানে তাঁর মৃত্যু হল। নবাব মিরজাফরকে ডেকে পাঠালেন। মিরজাফর এসে পরামর্শ দিলেন যুদ্ধ বন্ধ থাকুক, পরদিন যুদ্ধ হবে। এ-পরামর্শ নবাব প্রথমে নিতে চাননি। কিন্তু অন্য উপায় ছিল না। তাঁর সেনাপতি মোহনলালকে যুদ্ধ থামাতে বলা হল। মোহনলালের ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু নবাবের হুকুম মানতেই হয়। ইতিমধ্যে মিরজাফর ক্লাইভকে গোপনে খবর পাঠিয়ে দিলেন যে, নবাবের সৈন্যরা যুদ্ধ করবে না। ক্লাইভেরও দিনের বেলায় যুদ্ধ করবার ইচ্ছা ছিল না। তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখলেন নবাবের সৈন্যরা পিছু হটছে, তাঁর সেনাপতি কিলপ্যাট্রিক তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তখন আর কিছু করবার ছিল না। ক্লাইভ যুদ্ধে নেমে পড়লেন। সিরাজউদ্দৌলা বাধা দেবার চেষ্টা করলেন না। উটে চড়ে অল্প লোকজন সঙ্গে নিয়ে মুর্শিদাবাদে পালিয়ে গেলেন। তাঁর সব কামান পলাশিতে পড়ে রইল। বিকাল পাঁচটার মধ্যে পলাশির যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল।

নবাব মুর্শিদাবাদ থেকে ছদ্মবেশে নৌকা করে পালাতে চেষ্টা করলেন। পালিয়েও বাঁচতে পারেননি। দানশা ফকির বলে একজন তাঁকে চিনতে পেরে ধরিয়ে দেয়। সিরাজউদ্দৌলাকে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসা হল। কয়েক ঘণ্টা পরে মিরজাফরের ছেলে মিরনের হুকুমে তাঁকে হত্যা করা হল।

এইভাবে বাংলাদেশে কোম্পানির রাজত্বের সূত্রপাত হল। মিরজাফর তো তখন বৃদ্ধ এবং একেবারে ইংরাজদের হাতের পুতুল। কিছুদিন পরে তাঁকে সরিয়ে দিয়ে তাঁর জামাই মিরকাশিমকে নবাব করা হল। তাঁর সঙ্গেও ইংরাজদের বনল না। মিরকাশিম ভাল শাসক ছিলেন, কিন্তু ভাল যোদ্ধা ছিলেন না। ইংরাজদের সঙ্গে কয়েকটি যুদ্ধে হেরে গিয়ে পালিয়ে দিল্লির খুব কাছে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। সেখানে তিনি কীভাবে দিন কাটাতেন, একজন বিদেশীর লেখায় তা জানা যায়। মিরকাশিম কোষ্ঠী বিচারে খুব বিশ্বাস করতেন। সকালে

উঠে প্রতিদিন দেখতেন তাঁর ভাগ্য পরিবর্তন হবে কি না, আবার তিনি মুর্শিদাবাদের নবাব হতে পারবেন কি না। নিজের জন্য রান্নাও নিজের হাতে করতেন। ভয় ছিল খাবারে কেউ বিষ মেশাতে পারে। এই রকম করে দিল্লির প্রান্তে একদিন তাঁর মৃত্যু হল। ইতিমধ্যে বাংলা-বিহার-মুর্শিদাবাদে যাঁরা নবাব হলেন, তাঁদের কথা ইতিহাস বিশেষ বলেনি। বলবার মতোও নয়।

পলাশির যুদ্ধের পঞ্চাশ-ষাট বছরের মধ্যে কলকাতার চেহারা একেবারে বদলে গেল। ইংরাজের সংখ্যা বাড়ল। অনেক বড় বড় বাড়ি। পরিষ্কার রাস্তাঘাট। এখনকার বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগকে তখন বলা হত ট্যাঙ্ক স্কোয়ার। সেখানে শহরের লোকেদের ব্যবহারের জন্য ভাল পানীয় জল পাওয়া যেত। সে জন্যে সান্ত্রির পাহারা। কিন্তু শুধু এই নিয়ে তো নতুন শহর গড়ে ওঠে না। মানুষও চাই। নতুন ধরনের বাঙালি। তারপরের কলকাতার ইতিহাস তাদেরই কাহিনী। নবাবি আমলের বাঙালির সঙ্গে তাদের মিল নেই। 'ছেলেবেলা' বইতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, পশ্চিমে গঙ্গা, নালা কাটা ছিল, তাই দিয়ে বাড়িতে গঙ্গার জল এসে পৌঁছত। "তখন রাস্তার ধারে ধারে বাঁধানো নালা দিয়ে জোয়ারের সময় গঙ্গার জল আসত। ঠাকুরদার আমল থেকে সেই নালার জলের বরাদ্দ ছিল আমাদের পুকুরে।" কিন্তু পশ্চিম দিক থেকে শুধু জলই আসত না, আরও অনেক জিনিস আসতে আরম্ভ করেছিল। তাই নিয়ে গড়ে উঠল নতুন কলকাতা। নতুন বাংলার ইতিহাস।

হেস্টিংসের বন্ধু পলিয়ের

রবার্ট ক্লাইভ পলাশির যুদ্ধে জয়ী হওয়ার ফলে আস্তে-আস্তে বাংলা, বিহার, ওড়িশা নবাবের হাত থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে চলে এল, একথা সবাই জানে। কিন্তু যুদ্ধ জয় করা এক, আর দেশের উপর শাসন বিস্তার করা অন্য জিনিস। ক্লাইভ দেশে চলে যাবার পরে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার গভর্নর হয়েছিলেন। তখন কোম্পানির ক্ষমতা অনেক বেড়েছে। মুঘল সম্রাটের উত্তরাধিকারীরা আগেকার সম্রাটদের ক্ষীণ ছায়া মাত্র। দিল্লির বাদশাদের বলা হত শাহেনশা। অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীর মালিক, কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় দিল্লির বাদশাহের সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব দিল্লির চারপাশে কয়েক মাইলের মধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। গ্রীষ্মের দিনে পুকুর প্রায় শুকিয়ে গেলে তার মাঝখানে যেমন একটু তলানি পড়ে থাকে।

বাদশাহ শাহ আলমের নাম আগে ছিল আলি গহর। তাঁর সম্বন্ধে একটি পুরনো ছড়া আছে :

বাদশাহ শাহ আলম্,
দিল্লিসে পালম।

অর্থাৎ নামেই বাদশাহ, কিন্তু তাঁর সাম্রাজ্যসীমা হচ্ছে দিল্লি থেকে পালম গ্রাম পর্যন্ত। এখন যেখানে দিল্লির এয়ারপোর্ট হয়েছে, তারই

পাশে। কয়েক বছর আগেও এয়ারপোর্টে আসবার সময় পুরনো পালম গ্রামের বাড়িঘর দেখা যেত। এখন প্রাচীর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে, তাই পুরনো দিনের ছবি অল্পস্বল্পই চোখে পড়ে।

ওয়ারেন হেস্টিংস সম্পর্কে অনেক দুর্নাম আমাদের দেশে শোনা যায়। সেসব একেবারে মিথ্যা নয়। কোম্পানির তখন টাকা-পয়সার খুব অভাব ; যুদ্ধবিগ্রহ তো লেগেই আছে। তাঁকে অনেক সময় যে-উপায়ে টাকা যোগাড় করতে হয়েছে, তা প্রশংসনীয় নয়। অযোধ্যার বেগমদের উপর তিনি অনেক জবরদস্তি করেছিলেন, তাও সত্য। নন্দকুমারের ফাঁসির সঙ্গেও তাঁর নাম জড়ানো। সেসব সত্ত্বেও বলব, তাঁর অনেক সৎগুণ ছিল যা সাধারণত দেখা যায় না। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিদেশীদের যে সাধারণ অবজ্ঞা, তিনি তার থেকে অনেকাংশে মুক্ত ছিলেন। চোদ্দ বছর বয়সে এদেশে চাকরি নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর হাতের লেখা ভাল ছিল আর অঙ্ক জানেন, এই বলে চাকরির দরখাস্ত করেছিলেন। তাঁর নিজের হাতের লেখা দরখাস্ত এখনও আছে। দেখলে মনে হবে হাতের লেখা সম্বন্ধে কথাটি মিথ্যা বলেননি। এদেশে এসে তিনি ফার্সি শিখেছিলেন। বাংলাও বলতে শিখলেন। তিনি গভর্নর না হলে তখন সংস্কৃতের চর্চা কি আরবি-ফার্সির চর্চা বন্ধ হয়ে যেত। লেখাপড়ায় তাঁর খুব উৎসাহ ছিল। সংস্কৃতের প্রতি তাঁর অনুরাগ কারুর চেয়ে কম ছিল না। তাঁর একজন বন্ধু ছিলেন, নাম আঁতোয়ান ল্যুই আঁরি পলিয়ের। নামেই বোঝা যাচ্ছে, পলিয়ের ইংরেজ ছিলেন না, তাঁদের পরিবার আসলে ফরাসি। কিন্তু তাঁরা সুইট্‌জারল্যাণ্ডে এসে বসবাস করছিলেন। ১৭৫৭ সালে অর্থাৎ পলাশির যুদ্ধের বছরে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিতে পলিয়ের চাকরি পান। তাঁর কাকা পল পূর্বে মাদ্রাজে কোম্পানির চাকরি করে গিয়েছেন। আঁতোয়ান ল্যুই পলিয়ের অর্থাৎ ভাইপো কিছুদিন দক্ষিণ ভারতবর্ষে চাকরি করেছিলেন। ১৭৬১ সালে তৃতীয় পেশোয়া প্রথম বাজীরাওয়ের সঙ্গে পানিপথে আহমদ শাহ

আবদালির লড়াই হয়েছিল।

এই লড়াইয়ে মারাঠাদের পরাজয় হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসের স্রোত তার ফলে অন্য মোড় নিল। এই সময় আঁতোয়ান পলিয়ের সুবে বঙ্গ-বিহার-ওড়িশায় বদলি হয়ে এলেন।

কলকাতায় তখন নানারকম কাজের তোড়জোড় চলছিল। ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের কাছে কোম্পানির যে পুরনো কেল্লা ছিল, তা নবাবের সৈন্যদের হাতে তখন প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আরও দক্ষিণে ময়দানে নতুন কেল্লা গড়বার চেষ্টা চলছিল। মাদ্রাজের চিফ ইঞ্জিনিয়ার জন্ ব্রোহিয়ার কলকাতায় এসে কাজও আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর কাজ বেশিদূর এগোয়নি। তাছাড়া তাঁর সম্বন্ধে গুজব শোনা যাচ্ছিল যে, টাকাপয়সারও নাকি হিসাব-পত্র ঠিক নেই। এসব কথা হয়তো সত্যি, কারণ এক সুযোগে ব্রোহিয়ার কলকাতা থেকে পালিয়ে সিংহলে চলে গেলেন। সিংহল তখন ওলন্দাজদের হাতে। তাঁকে লোক পাঠিয়ে ধরে আনাও তাই সম্ভব ছিল না। বছর দুয়েক পলিয়ের কলকাতার দুর্গের কাজকর্ম দেখতে লাগলেন। তখন তিনি ছিলেন চিফ ইঞ্জিনিয়ার। পলিয়েরের অসুবিধা ছিল যে, তাঁকে কাজের জন্য যা টাকা দেওয়া হত, তাতে তাঁর খরচ কুলোত না। তাছাড়া খাটবার লোকের অভাব ছিল। তা হলেও পলিয়ের ভাল করে কাজ করেছিলেন। নতুন দুর্গের যে প্ল্যান ছিল, তার সামান্য অদল-বদল করে নদীর ধারে একটি বড় গেট তৈরি করাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এটিকে বলা হয় 'ওয়াটার গেট'। এর ফলে দুর্গ থেকে জাহাজ আসা-যাওয়ার খুব সুবিধা হয়েছিল। রবার্ট হজেস নামে এক চিত্রকর ১৭৮০ সালে কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি পলিয়েরের এই কাজের খুব প্রশংসা করে গিয়েছেন। পলিয়েরের তখন কাজকর্মে সুনাম হয়েছে। অযোধ্যার নবাবের একজন ভাল ইঞ্জিনিয়ারের দরকার ছিল। তাঁর কাছে পলিয়েরের নাম প্রস্তাব করে পাঠানো হল। তখন অযোধ্যা রাজ্যে অনেক ইংরেজ

চাকরি করতেন। নিজেরা ব্যবসা করে তাঁরা অল্পদিনের মধ্যেই খুব ধনী হয়ে উঠতেন। কিন্তু সবসময় ধর্মপথে নয়। পলিয়েরের আশা হয়েছিল, সবসময় তিনি চাকরি তো করবেনই, তাছাড়া অন্য ইংরেজদের মতো ব্যবসা করে রাতারাতি ধনী হয়ে যাবেন। তাঁর এ-স্বপ্ন সফল হয়নি। অল্পদিনের মধ্যে বোঝা গেল, তাঁর চাকরি নিয়ে কলকাতায় গোলমাল চলছে।

তখন কলকাতায় কোম্পানি রাজ্য চালাবার জন্য একটি ছোট কমিটি ছিল ; তাকে কাউন্সিল বলা হত। কাউন্সিলের পাঁচজন সদস্যের মধ্যে তিনজনই বললেন, পলিয়েরকে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে আনা উচিত, কারণ তিনি ওখানকার যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়েছেন। তাঁকে এ ক্ষমতা কে দিল ? ওয়ারেন হেস্টিংস অনেক প্রতিবাদ করলেন, পলিয়েরও কাউন্সিলকে জানালেন যে, এখন ফিরে গেলে তাঁর খুব টাকাপয়সার ক্ষতি হবে। তিনি অযোধ্যায় যে ব্যবসা করছিলেন, সে তো নতুন কিছু নয়, সব ইংরেজ কর্মচারীই এই কাজ করে থাকেন। কিন্তু ফল কিছুই হল না। অবশেষে আর কোনো উপায় রইল না, পলিয়ের কলকাতায় ফিরে এলেন। অল্পদিনের মধ্যে অযোধ্যার নবাবের টাকাপয়সার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে উঠল। একবার কথা হয়েছিল, পলিয়েরকে আবার লখনউ ফেরত পাঠানো হোক্, কিন্তু এই কারণে তা সম্ভব হল না।

পলিয়েরের দুঃখের দিন অবশ্য শেষ হয়ে আসছিল। কোম্পানির ডিরেক্টরদের কাছে ওয়ারেন হেস্টিংস খুব প্রশংসা করে চিঠি লিখেছিলেন। পলিয়ের বিরক্ত হয়ে কিছুদিন আগে কোম্পানির চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁকে ডেকে এনে লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্নেলের পদ দেওয়া হল এবং অযোধ্যায় থাকা সম্বন্ধেও কোনো নিষেধ রইল না। পলিয়ের তো খাঁটি ইংরেজ ছিলেন না। সেকথা আগেই বলেছি। খাঁটি ইংরেজ ছাড়া আর কাউকে লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্নেলের উপরের পদ পাবার যোগ্য বলে মনে করা হত না।

পলিয়ের এর পর থেকে বেশির ভাগ সময় লখনউয়ে থাকতেন। তাঁর অতিথি-সৎকারেরও প্রশংসা শোনা যায়। তখন ইংরেজরা কেউ কেউ ভারতীয় ভাষা ও ইতিহাস-চর্চা করতে ভালবাসতেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে পলিয়েরের এ-বিষয়ে কিছু মিল ছিল। পলিয়ের অনেক প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন। ১৭৮৪ সালে যখন কলকাতায় ওয়ারেন হেস্টিংস ও স্যার উইলিয়াম জোনস নানারকম গবেষণার জন্য এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন পলিয়ের প্রথম থেকেই তার সদস্য হয়েছিলেন। সে প্রায় দুশো বছর আগে, ১৭৮৪ সালে। এখন পার্ক স্ট্রিটে এশিয়াটিক সোসাইটির মস্ত বাড়ি। তখন সোসাইটির নিজের বাড়িঘর বলতে কিছু ছিল না। টাউন হলের কাছে সুপ্রিম কোর্টের বাড়িতে এশিয়াটিক সোসাইটির অফিস ছিল। পলিয়ের তো লখনউ থাকতেন, কাজেই সব অধিবেশনে আসতে পারতেন না। মাঝে-মাঝে এসে প্রবন্ধ পড়তেন, কিংবা আলোচনায় যোগ দিতেন। অল্পদিন পরে পলিয়ের ইউরোপে ফিরে গেলেন।

১৭৯৫ সালে একদল ডাকাতের হাতে পড়ে পলিয়েরের মৃত্যু হয়। ডাকাতরা তাঁকে আক্রমণ করেছিল কেন, বলি। এদেশে থাকবার ফলে পলিয়েরের একটা খারাপ অভ্যাস হয়েছিল। তিনি এদেশের রাজারাজড়াদের দেখাদেখি পোশাকের সঙ্গে হীরা জহরতও ব্যবহার করতেন বিস্তর। সম্ভবত তারই লোভে ডাকাতরা তাঁকে আক্রমণ করেছিল। পলিয়ের বেদের পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন। সেসব লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে দেখতে পাওয়া যায়। প্যারিসে বিখ্যাত লাইব্রেরি বিবলিওথেক নাশিওনাল-এ তাঁর সংগৃহীত অনেক আরবি ফার্সি ও সংস্কৃত কাগজপত্র আছে। প্রায় চল্লিশ বছর আগে এশিয়াটিক সোসাইটির বাড়িতে একটি সিন্দুকের মধ্যে তাঁর লেখা ইতিহাসের পাণ্ডুলিপির একটি খসড়া পাওয়া গিয়েছে। সেটি ছাপা হয়েছে। এশিয়াটিক সোসাইটির বাড়িতে পণ্ডিতদের অনেক পুরনো

মূর্তি ও তৈলচিত্র আছে। পলিয়েরের কিন্তু নেই। মূর্তির কথা উঠছে না, কিন্তু একটি তৈলচিত্র থাকলে মন্দ হত না। তবু যা হোক ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের গ্যালারিতে পলিয়েরের ছবি দেখতে পাওয়া যায়।

গৃহহীন লাটসাহেব

ডালহৌসি স্কোয়ার, অর্থাৎ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগের দক্ষিণে একটু গেলে লাটসাহেবের বাড়ি, রাজভবন। বাড়িটি তৈরি হয়েছিল মোটামুটি পৌনে দু'শো বছর আগে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রতিষ্ঠা আরও অনেক আগে হয়েছিল। কলকাতার জনক জোব চার্নকের নাম সবাই জানে। দুবার কলকাতায় এসে বসবাস করবার চেষ্টা তিনি করেছিলেন, পারেননি। তৃতীয়বার ১৬৯০ সালের আগস্ট মাসে তিনি কয়েকটি নৌকো নিয়ে এখনকার কলকাতার উত্তরদিকে সুতানুটি বলে একটি জায়গায় এসে উঠলেন। কয়েকটি ছোট ছোট চালাঘর, প্রায় ভেঙে গিয়েছে, আকাশের রঙ কালো, থেকে থেকে বৃষ্টি পড়ছে, মেঘ ডাকছে, নদীর জলের কাছে একটানা ব্যাঙের ডাক। কাছাকাছি আর কোনো জনমানব নেই। এইভাবেই কোম্পানির রাজত্বের শুরু হল।

জোব চার্নককে কেউ গভর্নর বলত না। তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এজেণ্ট। কয়েক বছর পরে কলকাতা বড় হতে লাগল। প্রথম দিকে বুঝবার উপায় ছিল না যে, চার্নক একদিন ভারতবর্ষে ইংরেজ শক্তির প্রতিষ্ঠাতা হবেন। এই সাধারণ ঘরে জোব চার্নক কোম্পানির জিনিসপত্রের দরদাম করতেন, হুঁকোয় তামাক খেতেন,

গাছের তলায় বসে ব্যাপারীদের সঙ্গে ব্যবসার কথা বলতেন। একটি বাঙালি মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন, সে তাঁর সংসার দেখত।

জোব চার্নক মারা গেলেন ১৬৯৩ খ্রিষ্টাব্দে। তখন তাঁর জিনিসপত্র, বিষয়সম্পত্তি যা ছিল বিক্রি হয়ে গেল। নিলামে দাম উঠল ৫৭৫ টাকা। কোম্পানির কাগজপত্র কিন্তু এই কুঁড়েবাড়িতে থাকত না। দপ্তরের কাগজপত্র রাখবার জন্য চার্নক একটি ছোট বাড়ি বানিয়েছিলেন। চার্নকের মৃত্যুর পর মাদ্রাজ থেকে একজন বড়কর্তা এসে কোম্পানির বাড়িঘরের ব্যবস্থা করলেন। ইটের তৈরি বাড়ি হল, মাটির গাঁথুনি। চারদিক ঘিরে দেয়াল। আশা ছিল অনুমতি পেলে এই বাড়িটিকেই অদলবদল করে দুর্গ বানানো হবে। জোব চার্নকের উত্তরাধিকারী তাঁর জামাই এলিসকে করা হল না। তাঁকে বলা হত অকর্মণ্য। তাঁর জায়গায় বসানো হল চার্লস আয়ার বলে একজনকে।

কোম্পানির কর্তারা একথা জানতেন যে, কেল্লা বানাবার অনুমতি বাদশা বা সুবেদারের কাছ থেকে সহজে পাওয়া যাবে না। শেষ পর্যন্ত তিন-চার বছর পরে কেল্লা বানানো শেষ হল। ইংরেজদের তখনকার রাজার নামে তার নাম হল ফোর্ট উইলিয়ম। গঙ্গার ধারে কেল্লা, পশ্চিম দিক দিয়ে ইচ্ছে করলে গঙ্গার জলে নেমে কেল্লায় ওঠা যায়। এখন যেখানে স্ট্র্যাণ্ড রোড, সেখানে তখন গঙ্গার জল আসত। কেল্লার ভেতরে অবশ্য গভর্নরের থাকবার বাড়ি ছিল। ১৭৫৬ সালে নবাব সিরাজদ্দৌলা যখন কলকাতা আক্রমণ করলেন, তখন তাঁর সৈন্যদের হাতে ফোর্ট উইলিয়মের খুব ক্ষতি হল। গভর্নরের বাড়ির যা ক্ষতি হল তাতে সেখানে আর বসবাস করা সম্ভব নয়। দুর্গ অবরোধের সময় গভর্নর ড্রেক পিছনের দরজা দিয়ে নৌকোয় উঠে মেয়েদের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলেন। পরে যখন শান্তি হল কিছুদিনের জন্য, তখনও গভর্নরের থাকবার কোনো বাড়ি ছিল না।

রবার্ট ক্লাইভ দেখতে-দেখতে বাংলা দেশে কোম্পানির কর্তা হলেন, তিনিই সর্বেসর্বা। কিন্তু তাঁরও থাকবার কোনো জায়গা নেই।

নতুন করে ফোর্ট উইলিয়ম গড়া হল। আগেকার ফোর্ট উইলিয়ম ছিল এখন যেখানে বড় ডাকঘর কিংবা ফেয়ার্লি প্লেসের রেলের আপিস, তার অনেক দক্ষিণে, ময়দানে গঙ্গার গা ঘেঁষে। ক্লাইভ দুবার বাংলার গভর্নর হয়েছিলেন। কিছুদিন থাকতেন এখনকার রাইটার্স বিল্ডিংসের পিছনে। ঠিক কোন বাড়িতে, তা নিয়ে মতভেদ আছে। সেই সব আলোচনায় দরকার নেই। কখনও থাকতেন হুজুরিমল বলে একজন ব্যবসায়ীর বাড়িতে। ধনী বলে হুজুরিমলের তখন খুব নাম ছিল। ক্লাইভের পরে ভ্যান্‌সিটার্ট গভর্নর হয়ে এলেন। তিনি মিরজাফরকে সরিয়ে দিয়ে তাঁর জামাই মিরকাশিমকে নবাব করে দিলেন। মিরজাফর তখন বেশ বুড়ো হয়েছেন। তাছাড়া অনেক দিন ধরে আফিং খেতেন বলে বুদ্ধিসুদ্ধিও পরিষ্কার ছিল না। কিন্তু তিনি একটি কথা বুঝেছিলেন যে, মুর্শিদাবাদে তাঁকে রাতারাতি খুন করে গেলেও কেউ কিছু বলবে না। তাঁর কথা শুনে ক্লাইভ তাঁকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। প্রথমে তাঁকে রাখা হত চিতপুর অঞ্চলে। পরে তাঁর জন্য অন্য জায়গা ঠিক হল। ভবানীপুরের দক্ষিণে তখন বাড়িঘর বেশি ছিল না, খোলা জায়গা। মিরজাফর আলি তাঁর বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন নিয়ে কয়েক বছর এইখানে থাকলেন। তাঁর নামে জায়গার নাম হল আলিপুর।

ক্লাইভ অনেক রকম পরিবর্তন এনেছিলেন। কিন্তু নিজের জন্য ভাল করে বাড়িঘর করার সময় বা ইচ্ছা তাঁর ছিল না। কলকাতার উত্তরে এখনকার যশোর রোডের ধারে একটি বড় পুরনো বাড়ি পড়ে আছে। এটিকে বলা হয় ক্লাইভের কান্‌ট্রি হাউস অর্থাৎ বাগানবাড়ি। এখন সে-বাড়িতে অনেক লোকজনের আবাস। তাঁরা অবশ্য ক্লাইভের কেউ নন। ক্লাইভের পরের গভর্নর ছিলেন ভ্যান্‌সিটার্ট, যিনি ১৭৬০ সালে মিরকাশিমকে নবাব করেছিলে। তাঁর থাকবার জন্য কি কোনো সরকারি বাড়ি তৈরি হয়েছিল ? ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের (এখনকার বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ) দক্ষিণে একটি ছোট গলি

আছে। কেউ কেউ বলেন এখানে সেনাপতি স্যার আয়ার কুটের বাড়ি ছিল। সম্ভবত ভ্যান্‌সিটার্ট এখানে কিছুদিন বাস করেছিলেন। এই গলিটির নাম ভ্যান্‌সিটার্ট রো। ওয়ারেন হেস্টিংস যখন কোম্পানির চাকরি নিয়ে এলেন তখন তাঁর বয়স চোদ্দ। তখন তিনি কনিষ্ঠ কেরানিদের মধ্যে একজন। তাঁর মতো বিচিত্র অভিজ্ঞতা বোধহয় আর কোনো গভর্নরের হয়নি। তিনি প্রথমে গভর্নর হয়েছিলেন। তারপর রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাস হওয়ার পর গভর্নর জেনারেল হয়েছিলেন। অর্থাৎ শুধু বাংলা নয়, বোম্বাই ও মাদ্রাজও তাঁর অধীনে এল। আগে যে রাস্তাকে হেস্টিংস স্ট্রিট বলা হত, এখন তার নাম কিরণশঙ্কর রায় রোড। সেই রাস্তার উপরে দক্ষিণ দিকে মুখ করে একটি বড় বাড়িতে ওয়ারেন হেস্টিংস অনেকদিন ছিলেন। লোকে তখন বাড়িটিকে হেস্টিংস মেমসাহেবের বাড়ি বলত। এখন সে-বাড়ির একতলায় খোপের মতো অনেক দোকানঘর হয়েছে। দোতলার একটি বড় ঘরে ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে যে টানাপাখা ঝুলত, তার অবশিষ্ট কিছুদিন আগেও ছিল। কাঠের উপর নানা রংয়ের বিচিত্র কারুকার্য। হেস্টিংস অন্তত আরও একটি বাড়ি করেছিলেন। তাকে এখনও হেস্টিংস হাউস বলা হয়। বাড়িটি আলিপুরে আদিগঙ্গার কাছে। এই বাড়িতে শুনেছি ভূতের উপদ্রব হত। বছরে একদিন হেস্টিংসের ছায়ামূর্তি ঘুরে বেড়াত। এখন সে-বাড়িতে শিক্ষিকাদের জন্য স্কুল খোলা হয়েছে। ভূতের আসা-যাওয়ার কথাও আর শোনা যায় না।

গভর্নর জেনারেল কর্নওয়ালিস বিলেতে বড় বংশের সন্তান ছিলেন। কিন্তু তাঁর থাকবার ব্যবস্থা যে খুব ভাল ছিল, তা নয়। তিনি থাকতেন এসপ্ল্যানেডে। এসপ্ল্যানেড বলতে তখন অনেক বড় জায়গা বোঝাত। গভর্নরের বাড়ি নিয়ে তিনি বিশেষ কোনো আপত্তি করেননি। আপত্তি হল যখন ওয়েলেসলি গভর্নর জেনারেল হয়ে এলেন। তিনি একটু মেজাজি লোক ছিলেন। বাড়ির হাল দেখে

তিনি বিলেতে চিঠি লিখলেন। এ কী কথা! এই সব ঘরবাড়ি কি গর্ভনর জেনারেলের থাকার যোগ্য! তাঁর লোকজন, কর্মচারী, বন্ধুবান্ধব সবাইকে নিয়ে এরকম ছোট আর খারাপ বাড়িতে কি কেউ থাকতে পারে? অনেক ভারতীয় কলকাতায় থাকেন, যাঁদের বাড়ি এর চেয়ে বড়। এতে কি লাটসাহেবের মর্যাদা লাঘব হচ্ছে না? অবিলম্বে নতুন বাড়ি তৈরি করা উচিত। বাড়ি তৈরি হল বটে, কিন্তু এ নিয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে ওয়েলেসলির সম্পর্ক খুব তিক্ত হয়েছিল। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত লাটসাহেবের থাকবার ব্যবস্থা হল।

লাটসাহেবের বাড়ি হল

গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি সাহেব তো ঠিক করলেন যে, এভাবে আর চলছে না, লাটসাহেবের নিজের বাড়ি দরকার। কিন্তু কী করে হবে সে বিষয়ে অনেক প্রশ্ন থেকে গেল। বাংলা-বিহার-ওড়িশা প্রায় পঞ্চাশ বছর হল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে এসেছে। দেশে অনেক দুর্বল রাজ্য আছে বটে, কিন্তু তারা তখনও ইংরেজের মুঠোর মধ্যে আসেনি। বড় রাজ্যদের মধ্যে অবশ্য নিজামের কথা বলা যায়। কিন্তু ক্ষমতা বলতে বিশেষ কিছু নেই। গত একশো বছর ধরে নিজাম অনেক যুদ্ধ করেছেন, কিন্তু প্রায় কোনো যুদ্ধেই জিততে পারেননি। তা ছাড়া অবশ্য পশ্চিমে মারাঠারা রয়েছে, দক্ষিণে টিপু সুলতান। এদের সঙ্গে একহাত লড়াই হয়ে গিয়েছে। ইংরেজদের তাতে সুবিধাই হয়েছে বলতে হবে। কিন্তু ভবিষ্যতের বড় লড়াই তখনও বাকি। তাতে অনেক টাকা খরচ হবে নিশ্চয়ই। বিলেতে কোম্পানির কর্তারা অর্থাৎ ডিরেক্টররা লড়াই করবার কথা শুনলে খুশি হতেন না। হারলে সর্বনাশ, জিতলে লাভের গুড় পিঁপড়ে খেয়ে যাবে এত খরচ। আর বড় বাড়ি করবার খরচ চাইলেই কি কোম্পানির কর্তাদের কাছে পাওয়া যেত ? ওয়েলেসলি অবশ্য অতশত ভাবলেন না। বিলেতের কর্তাদের সব কথা জানাতে হবে,

এই চিন্তা তাঁর মনে ঠাঁই পেল না।

বাড়ি করা তো ঠিক হল, কিন্তু কী ধরনের বাড়ি ? ভারতবর্ষে তো বিভিন্ন রকমের প্রাসাদ তৈরি হয়ে এসেছে। মোগল সম্রাটরা হিন্দু মুসলমান দু-রকম স্থাপত্যকে মিলিয়ে স্থাপত্যে নতুন চেহারা আনবার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের সময়ের আঁকা ছবিতেও এই চেষ্টা ধরা পড়ে। কিন্তু দেশীয় রীতি পছন্দ হল না। কী পছন্দ হল বলছি। লাটসাহেবের বাড়ি তৈরি হবার একশো বছর পর লর্ড কার্জন এদেশের বড়লাট হয়ে এসেছিলেন। তাঁর ঠাকুরদার ঠাকুরদার সময়ে ইংলণ্ডের ডার্বিশায়ার অঞ্চলে তাঁরা বসতবাড়ি বানিয়েছিলেন। তখনকার একজন বিখ্যাত স্থপতি রবার্ট অ্যাডম্ সাহেব এর প্ল্যান তৈরি করেছিলেন। সেই নকশা অনুসারে সরকারের একজন ইঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেন ওয়াট ও ক্যাপ্টেন টিরেটোকে প্ল্যান তৈরি করতে বলা হল। টিরেটোর তখন খুব নামডাক। এখন কলকাতার টেরিটিবাজার অঞ্চল তাঁরই সম্পত্তি ছিল। টিরেটোর প্ল্যান শেষপর্যন্ত পছন্দ হল না। কত টাকা লাগবে হিসেব করে দেখা গেল পাঁচ লাখ ঊনত্রিশ হাজার সিক্কা টাকা। সিক্কা টাকার বাজারদর সাধারণ টাকার চেয়ে একটু বেশি ছিল। এটা মনে হয় শুধু বাড়ি তৈরির খরচ।

বাড়ির যখন ভিত্তি স্থাপন করা হল, লর্ড ওয়েলেসলি নিজে কিন্তু তখন উপস্থিত থাকতে পারলেন না। দক্ষিণে যুদ্ধের বাজনা বেজে উঠল। বড়লাট কলকাতা থেকে কুচ আরম্ভ করলেন। টিমথি হিকি নামে একজন ইঞ্জিনিয়ার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। তিনি যে বিখ্যাত লোক ছিলেন তা নয়, তবে তাঁর এক আত্মীয় নামকরা ছবি-আঁকিয়ে ছিলেন। লর্ড ওয়েলেসলিও তাঁকে দিয়ে তাঁর নিজের প্রতিকৃতি আঁকিয়েছিলেন।

১৭৯৮ সালের মে মাসে বাড়ির কাজ আরম্ভ হয়েছিল। ১৮০২ সালের প্রথম দিকে বেশির ভাগ কাজ শেষ হয়ে গেল। ছোটবড়

খানার ব্যবস্থা হতে লাগল লাটসাহেবের বাড়িতে। এই যে এত বড় কাণ্ড ঘটে গেল কলকাতায়, সে-খবর বড়লাট প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডের কর্তাদের জানাননি। ওয়েলেসলি বলতেন, তিনি তো দুটি চিঠি লিখেছিলেন। একটি হল ১৭৯৮ সালে, আর একটির তারিখ এপ্রিল ১৮০১। তাতে সব জিনিস পরিষ্কার করে বলা হয়েছিল। তা ঠিক নয়, কাগজপত্র ঠিকমতন কি পাঠানো হয়েছিল ? সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। বিলেতে খোঁজ করে সে-ধরনের কোনো চিঠির হদিস পাওয়া যায়নি। ওয়েলেসলি অবশ্য জানিয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষ এমন পোড়া দেশ যে, এখানে পুরনো বাড়ি মেরামত করার চেয়ে নতুন বাড়ি তৈরি করার খরচ কম। পরে অবশ্য দেখা গেল খরচ অনেক বেশি পড়েছে। বাড়ি তৈরি করতে সাত লাখ টাকার উপর, আশেপাশের জমি ও বাড়ি কিনতে আরও পাঁচ লাখ একাত্তর টাকা, আর নতুন নতুন রাস্তা বানাতে সাতাশ হাজার টাকা খরচ পড়েছে। সবসুদ্ধ ১৩,০১,২৮৬ সিক্কা টাকা। অনুমতিও চাওয়া হয়নি, এবং বাড়ি যে আরম্ভ হয়েছে সে-কথাও জানানো হয়নি। বরং কার্জন পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলেন, যে মোটা বাঁধানো খাতায় এই সব চিঠি থাকলেও থাকতে পারত, তার পাতা কে যেন ছুরি দিয়ে কেটে নিয়েছে, এইসব থেকে আসল ব্যাপার বুঝতে কি কারুর বাকি থাকে !

একটি কথা মনে হতে পারে। কলকাতায় বড়লাটসাহেবের বাড়ি তৈরি হচ্ছে একথা লণ্ডনে ঘুণাক্ষরেও কি কেউ জানত না ? বিশ্বাস করা কঠিন। তখন ইউরোপের সঙ্গে চিঠিপত্র যাতায়াতে অনেক সময় নিত। ছ' সাত মাস তো বটেই, কখনও কখনও বছর পেরিয়ে যেত। সেজন্য সাহেব-বিবিরা দেশে খুব বড়-বড় চিঠি লিখতেন। তাতে সবরকম খবর থাকত। পাশের বাড়ির মেমসাহেব ইউরোপ থেকে কীরকম নতুন ফ্যাশানের গাউন আনিয়েছেন, ও বাড়ির বাবুর্চি গেল মাসে পার্টির দিন কী রকম ভাল হাঁসের রোস্ট করেছিল, এইসব কথা। তাঁরা কি কেউই গল্প করেননি যে, কলকাতায় এক অদ্ভুত

ঘটনা ঘটছে। বড়লাটসাহেবের বাড়ি ? ইংলণ্ডের লোকেরা বিলেতে বসেই এদেশ সম্পর্কে অনেক খবর পেতেন। তাঁরা কি এ খবর কখনও শোনেননি ?

এই প্রশ্নের উত্তর কার্জন নিজেই দেবার চেষ্টা করেছেন। ভাসাভাসা খবর সম্ভবত বিলাতে পৌঁছেছিল, কিন্তু কী করা যেতে পারত। প্রত্যেক জাহাজেই ওয়েলেসলির যুদ্ধজয়ের খবর আসছে, আর শোনা যাচ্ছে কীভাবে ক্রমাগত তিনি কোম্পানির রাজত্বের সীমা বাড়িয়ে চলেছেন। ডিরেক্টররা যাই মনে করুন না কেন, এই গভর্নর জেনারেল যদিও অবাধ্য, তবু তাঁকে প্রথমে ঘাঁটাতে সাহস পেলেন না। তাঁর বিরুদ্ধে কিছু করলে দেশের লোক কি খুশি হত ? তখন বিলেতের উইলিয়ম পিট এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতারাও তাঁর বন্ধু। তাছাড়া এ-কথাও প্রমাণ করা শক্ত হত যে, বিলেতের বড়কর্তারা আদপেই কিছু জানতেন না। ডিরেক্টরদের কিল খেয়ে কিল চুরি করার মতো অবস্থা হল। তাঁরা শেষ পর্যন্ত একটি বড় চিঠিতে গভর্নর জেনারেল কী কী অবাধ্যতা করেছেন তার ফিরিস্তি লিখে পাঠালেন। সবাই যে ওয়েলেসলির ব্যবহারে খুশি ছিলেন তা নয়, কিন্তু মোটের উপর ওয়েলেসলির দিকেই পাল্লা ভারী ছিল।

লাটপ্রাসাদের যেদিন ঘটা করে দ্বার উন্মোচন হল, সেদিন লর্ড জর্জ ভ্যালেনসিয়া নামে একজন ভ্রমণকারী কলকাতায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে লিখেছেন, লাটসাহেবের বাড়ি তৈরি করতে অনেক খরচ হয়েছে তো কী হয়েছে ? বড়লাটবাহাদুর কি কুঁড়েঘরে থাকবেন ? মোগলরা যে ভারতবর্ষে এত খরচ করে বাড়িঘর করেছিল, ঠিক করেছিল। আসল কথা, বিলেতে ডিরেক্টররা ব্যবসায়ী ছাড়া কিছু নয়, তারা শুধু মসলিন কাপড় মাপতে জানে আর জিনিস ওজন করতে জানে, এসবের কদর বুঝবার ক্ষমতা তাদের নেই।

যে যাই বলুন না কেন, তখন অনেক ইংরেজও এই কথা

ভাবতেন। যে গভর্নর জেনারেল কোম্পানির শত্রুদের অল্প কয়েক বছরের মধ্যে শেষ করে দিলেন, তাঁকে 'কেন তিনি বাড়িঘর তৈরি করতে এত খরচ করেছেন', 'কেন তিনি আগে অনুমতি নেননি', এই সব প্রশ্ন করা কি মানায় ?

টোপিওয়ালা ও একটি খুনের গল্প

পুনা শহরে খুব শীত পড়ে না। কিন্তু যে কয়েক মাস শীত থাকে, সে-সময় খুব আরামের। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও কাঁধের উপর একটা শাল রেখে রোদ্দুর পোহাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর মন ভাল ছিল না। পানের বাটা থেকে একটা আস্ত পান ও কয়েক টুকরো সুপুরি তুলে নিলেন। অপ্রসন্ন মুখে মন্ত্রী সদাশিব মানকেশ্বরকে বললেন, "টোপিওয়ালাদের কাণ্ড দেখলে? আবার গায়কোয়াড়ের হিসেব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করেছে!"

সদাশিব মানকেশ্বর বললেন, "হুজুর, আংরেজদের কথা আর বলবেন না। এই হিসেবপত্তরের কাজ দশ বছর ধরে বেশ ঢিমেতালে চলছিল। তাতে কি কারুর কোনো ক্ষতি হয়েছে? আজ তড়িঘড়ি হিসেব মেলাতে হবে, এ কি সহজ!"

বাজীরাও একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলেন। গলা দিয়ে একটা শব্দ বার করলেন ; মনে হল তাঁর মেজাজ আরও খারাপ হয়েছে। তিনি বললেন, "একটা জিনিস দেখেছ সদাশিব? সেই নচ্ছার গঙ্গাধর শাস্ত্রীকে নাকি আবার গায়কোয়াড় এখানে পাঠাচ্ছে!"

সদাশিব হয়তো ভাবছিলেন, সে-সব দিন আর নেই। এখন আংরেজরা যা বলে তাই হয়। কিন্তু প্রভুর মেজাজ বুঝে কথাটা আর

তুললেন না। বাজীরাও পানের বাটা আবার কাছে টেনে নিলেন।

নামে দ্বিতীয় বাজীরাও বটে, কিন্তু প্রথম বাজীরাওয়ের সঙ্গে তাঁর চরিত্রের বিন্দুমাত্র মিল নেই। প্রথম বাজীরাও যেমন সাহসী ছিলেন, তেমনি ভবিষ্যৎ-দর্শী। তাঁর সঙ্গে দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের তুলনা হয় না। ১৮০২ সালে ইংরেজের সঙ্গে এক সন্ধির ফলে, পেশোয়া আর ইচ্ছেমতো সৈন্যসামন্ত রাখতে পারেন না। অন্য মারাঠা রাজ্যের উপরেও প্রতিপত্তি কমে গিয়েছে। বাজীরাও বললেন বটে যে, তিনি গঙ্গাধর শাস্ত্রীর মুখদর্শন করবেন না, কিন্তু অল্প কয়েকদিন পরেই বুঝতে পারলেন, রাগ দেখিয়ে লাভ নেই, পুরনো দিন আর ফিরে আসবে না। ঢিমিয়ে-ঢিমিয়ে আবার হিসেবপত্তরের আলোচনা চলতে লাগল। বাজীরাওয়ের মেজাজ খারাপ হবার যথেষ্ট কারণ ছিল। গঙ্গাধর শাস্ত্রী অন্য মহারাষ্ট্রীয়দের মতো ছিলেন না। ধীরস্থির ভাবে কথা বলা বা চলাফেরা করার অভ্যাস তাঁর ছিল না। তড়বড় করে কথা বলতেন, তাড়াতাড়ি হাঁটতেন, দু'একটি ইংরেজি গালিগালাজও জানতেন। পেশোয়ার নাম উঠলেই বলতেন 'সেই ড্যাম্ রাস্কেল'। এ অবস্থায় কাজ বেশিদূর এগোবার কথা নয়।

হিসেবও অনেক টাকার। ১৮০৬ সালে পেশোয়া বলেছিলেন, তিনি গায়কোয়াড়ের কাছ থেকে পাবেন দু'কোটি আটাত্তর লাখ ষাট হাজার টাকার বেশি। এ ছাড়াও অন্যান্য নানা খাতে আরও পঞ্চাশ লাখ টাকা। পুরনো ধারের নিয়মই হচ্ছে, যত দিন যায় টাকার অঙ্কও ততই বেড়ে চলে। পাঁচ বছর বাদ ১৮১১ সালে পেশোয়া বললেন এই দাবির প্রথম কিস্তি বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তিন কোটি ছিয়াশি লাখ ছিয়াত্তর হাজার টাকার বেশি। তাছাড়া অন্যান্য খাতের দাবিও সেইরকম বেড়েছে। গায়কোয়াড়ও কম যান না। বললেন, পেশোয়ার কাছে তাঁরও অনেক টাকা পাওনা। কয়েক মাস এইভাবে গেল। ভবিষ্যতে যে মিটমাট হবে সে আশা কম। ইংরেজরা বলে পাঠালেন, আর আলোচনা চালিয়ে দরকার নেই, যথেষ্ট হয়েছে।

কিন্তু হঠাৎ মনে হল, চাকা যেন অন্যদিকে ঘুরছে। পেশোয়া যেন অনেকটা নরম হয়েছেন। গঙ্গাধর শাস্ত্রীকে তো তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। গুজব উঠল, তিনি নাকি তাঁর শালীর সঙ্গে গঙ্গাধর শাস্ত্রীর ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ করছেন। অবিশ্বাস্য ব্যাপার ! যাই হোক, বাজীরাও গঙ্গাধর শাস্ত্রীকে সঙ্গে করে নাসিকে তীর্থ করতে গেলেন। সেখান থেকে আবার পন্ঢারপুরে। পন্ঢারপুর তখনকার দিনের একটি বিখ্যাত তীর্থস্থান।

পন্ঢারপুরে যে-কয়দিন ছিলেন, গঙ্গাধর শাস্ত্রী প্রতি সন্ধ্যায় বিঠোবার মন্দিরে আরতি দেখতে যেতেন। বিঠোবাকে আমরা বলি বিষ্ণু। একদিন, ২০শে জুলাই, সন্ধ্যায় গঙ্গাধর শাস্ত্রী বললেন যে, তাঁর মন্দিরে যাবার ইচ্ছে নেই। শরীর ভাল নেই। পীড়াপীড়িতে অবশ্য শেষপর্যন্ত তিনি যেতে রাজী হলেন।

তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। গঙ্গাধর শাস্ত্রীর একজন অনুচর শুনতে পেল কে একজন বলছে, "গঙ্গাধর শাস্ত্রী কোন্ লোকটি ?" তার সঙ্গী উত্তর দিল, "ঐ যে, দেখছ না, গলায় সোনার হার রয়েছে।" নামকরা বিদেশী অন্য শহরে এলে এরকম জিজ্ঞাসাবাদ হয়েই থাকে। মন্দিরে আরতি শেষ হয়ে গেল। পেশোয়ার সহচর ত্র্যম্বকজি ডাংলে তখন মন্দিরে ছিলেন। গঙ্গাধর শাস্ত্রীর সঙ্গে তাঁর দু' একটি কথা হল। শাস্ত্রী তার পর বাড়ির দিকে ফিরলেন।

পথে কী হল বলছি। মন্দির থেকে তাঁরা কয়েক পা এগিয়েছেন, এমন সময় হঠাৎ তিনজন লোক গঙ্গাধর শাস্ত্রীর পিছন থেকে তাঁর প্রায় গা ঘেঁষে দৌড়ে চলে গেল। প্রথমে মনে হল, তাদের ডান হাতে একটি করে চাদর ঝুলছে। মিনিটখানেক পরে বোঝা গেল যে শুধু কাপড় নয়, কাপড়ের তলায় ঢাকা তলোয়ার। প্রথমে যে লোকটি ছিল, সে তলোয়ার দিয়ে গঙ্গাধর শাস্ত্রীকে আঘাত করল। গঙ্গাধর শাস্ত্রী তখনও দাঁড়িয়ে থাকবার চেষ্টা করছিলেন। দ্বিতীয় লোকটি তাঁর চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল। তৃতীয়

লোকটি তলোয়ার দিয়ে মাথায় কোপ মারল। গঙ্গাধর শাস্ত্রীর জীবন শেষ হয়ে গেল। সঙ্গে কয়েকজন সৈন্যসামন্ত বরকন্দাজ ছিল। তাদের চোখের সামনে খুন হয়ে গেল।

হত্যা করা পাপ। সেই যুগে ব্রহ্মহত্যার মতো পাপ আর কিছু ছিল না। তা ছাড়া, যাঁকে খুন করা হল, তিনি তো সাধারণ লোক ছিলেন না। গায়কোয়াড়ের দূত। তাঁর মৃত্যুতে যে শোরগোল উঠবে, সে তো জানা কথা। তখন প্রতি মারাঠা রাজ্যে একজন করে উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী থাকবার নিয়ম ছিল। পুনায় যিনি ছিলেন, তাঁর নাম মাউণ্টস্টুয়ার্ট এলফিন্‌স্টোন। তিনি কাজকর্মে সুদক্ষ বলে নাম ছিল। তা ছাড়া তিনি পণ্ডিত লোকও ছিলেন। এলফিন্‌স্টোনের দৃঢ় বিশ্বাস হল, ত্র্যম্বকজি ডাংলেই প্রধানত হত্যার জন্য দায়ী। পেশোয়াকে বলে পাঠালেন, ত্র্যম্বকজিকে এখনই বন্দী করা হোক। পেশোয়া অনেক ওজর-আপত্তি করলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গভর্নর-জেনারেল লর্ড হেস্টিংসের ভাবগতিক দেখে বেশিদূর যেতে সাহস করলেন না। বড়োদা রাজ্যে গোবিন্দরাও বন্ধুজি ও ভগবন্ত রাওকে গ্রেপ্তার করা হল। সেই সঙ্গে ত্র্যম্বকজিকেও বন্দী করে বোম্বাইয়ের কাছে থানা কেল্লায় রাখা হল। সেখানে তাঁকে অবশ্য বেশিদিন আটকে রাখা যায়নি। ইংরেজরা ভেবেছিলেন, থানা কেল্লায় সৈন্যদের মধ্যে একজনও মহারাষ্ট্রীয় প্রহরী থাকবে না, তাহলে ষড়যন্ত্র হতে পারে। কিন্তু সৈন্যরা সবাই ইংরেজ। তারা মারাঠি ভাষা একেবারে বুঝত না। বিপদ সেই দিক থেকেই এল। প্রতিদিন দুপুরে শোনা যেত দুর্গের বাইরে একজন ঘেসেড়া মারাঠি গান গাইছে। সেটি আসলে পালাবার সঙ্কেত। কিন্তু একমাত্র ত্র্যম্বকজি তার প্রকৃত অর্থ বুঝতে পেরেছিলেন। কয়েক বছর পরে ১৮১৯ সালে যখন পেশোয়া-রাজত্ব শেষ হয়ে গিয়েছে, তখন একজন পাদরি, বিশপ হিবার, দাক্ষিণাত্যে ঘুরতে ঘুরতে এই গানটির হদিস পেয়েছিলেন। গানটি তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করে গিয়েছেন। আসল মারাঠি গানটি এখন

খুঁজে পাওয়া মুশকিল। হিবারের ইংরেজি অনুবাদ থেকে বাংলা অনুবাদ করে দিয়েছেন 'পাক্ষিক আনন্দমেলা'র সম্পাদক-মশাই। সেটি এইরকম :

ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে
তীরন্দাজ,
ঘোড়াগুলি আছে বৃক্ষতলে।
কোথা পাব আমি সেই বীর, বিনা
বাক্যে আজ
সঙ্গী হবে যে এ-জঙ্গলে ?
যুদ্ধের ঘোড়া পঞ্চান্নটি
তৈরি এই,
যোদ্ধা কিন্তু চুয়ান্নের
বেশি নেই, বাদবাকিটি এখানে
এসে গেলেই
দাক্ষিণাত্য জাগবে ফের।

ত্র্যম্বকজি সেই পঞ্চান্নতম যোদ্ধা। ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। সমুদ্রের খাঁড়ি পার হলেই তো পেশোয়া রাজ্য। ত্র্যম্বকজি কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। তাঁকে গ্রেপ্তার করে বিহারের চুনার দুর্গে নিয়ে যাওয়া হল। ভগবন্ত রাও, গোবিন্দরাও বন্ধুজি ও বড়োদার দেওয়ান সীতারামকেও অন্যত্র বন্দী করে রাখা হয়েছিল। চুনারে ত্র্যম্বকজি আরও পাঁচ বছর বেঁচে ছিলেন। হিবার সাহেবও চুনারে তাঁকে দেখতে এসেছিলেন। গারদের ওদিকে ত্র্যম্বকজি ; সপ্রতিভ চেহারা, ভেঙে পড়েননি, গায়ে ময়লা পোশাক। এই কি গঙ্গাধর শাস্ত্রীর হত্যাকারী ? না হত্যার সূত্র খুঁজতে অন্যত্র, গায়কোয়াড়ের রাজ্যে, যেতে হবে ? ভগবন্ত রাও, গোবিন্দরাও বন্ধুজি, না দেওয়ান সীতারাম ? কে হত্যাকারী ?

নিকোলাও মানুচির গল্প

১৬৫৩ সাল, নভেম্বর মাস। ইটালির ভেনিস বন্দরে একটি ছোট জাহাজ অপেক্ষা করছিল। এক-মাস্তুলের জাহাজ, বড় সমুদ্রে পাড়ি দেবার জন্য তৈরি হয়নি। এই জাহাজে সেদিন এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ছদ্মনামে দূরদেশে পালাবার চেষ্টা করছিলেন। তাঁর নাম লর্ড বেলমন্ট। ইংল্যাণ্ডে তখন বড় রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে। অলিভার ক্রমওয়েল দেশের শাসক। ইংল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছেন। যাঁরা তাঁর বন্ধু ছিলেন, তাঁদের বিপদ হতে পারে এই মনে করে লর্ড বেলমেন্ট ভারতবর্ষের দিকে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিলেন। জাহাজ ছাড়বার একদিন পরে শোরগোল শোনা গেল। চোদ্দ বছরের একটি ছেলে জাহাজ ছাড়বার আগের দিন এসে লুকিয়ে ছিল। পরের দিন খিদের কষ্ট সইতে না পেরে জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছে গিয়ে ধরা দিয়েছে। ছেলেটির নাম নিকোলাও মানুচি। অনেকদিন থেকে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। পৃথিবী ঘুরে দেখবে। বাবার কড়া নজর ছিল, এইবার সে বাবার চোখ এড়িয়ে জাহাজে এসে লুকিয়ে ছিল। লর্ড বেলমেন্টের একটি ছোকরা চাকরের দরকার ছিল, যে তার কাপড়চোপড় গুছিয়ে রাখবে, দেখাশোনা করবে। মানুচিকে তাঁর

পছন্দ হয়ে গেল। মানুচিকে তিনি কাজে বহাল করলেন।

জাহাজের প্রথম গন্তব্য স্মার্না। স্মার্না তুরস্ক দেশের একটি বন্দর। সাতদিন স্মার্নায় থাকবার পরে জাহাজ আবার চলতে লাগল। এ সব জাহাজ জোরে যেতে পারে না। পরের বছর সেপ্টেম্বর মাসে তাঁরা পারস্য দেশের সিরাজ শহর হয়ে বন্দর আব্বাসে পৌঁছলেন। খোলা সমুদ্রে পাড়ি দেবার জন্য বড় জাহাজ দরকার। মানুচি ও তার প্রভু 'সি হর্স' জাহাজে জায়গা পেয়ে ১৬৫৬ সালে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে সুরাট বন্দরে এসে পৌঁছলেন।

সুরাট সমুদ্রতীরে নয়। মাইল দশেক ভেতরে একটি নদীর ওপরে। সেখান থেকে হাঁটাপথে বুরহানপুর, গোয়ালিয়র, ঢোলপুর হয়ে শেষে আগ্রা। মোগল সম্রাট কিন্তু তখন দিল্লিতে ছিলেন। মথুরা হয়ে দিল্লি যাবার পথ, কিন্তু সেখানে পৌঁছবার আগেই মানুচির মনিব হঠাৎ মারা গেলেন। মানুচি একা দিল্লি এসে পৌঁছলেন। তখন সম্রাট শাজাহানের বয়স হয়েছে। তাঁর চার ছেলেদের মধ্যে শত্রুতা আরম্ভ হবে বোঝা যাচ্ছিল। মানুচি শাজাহানের বড় ছেলে দারার সৈন্যদলে গোলন্দাজের পদ পেলেন। সে সময় ইউরোপ থেকে কোনো বিদেশী এলে দুটি চাকরি সব সময় পাওয়া যেত। হয় সৈন্যদলের চাকরি, নয় ডাক্তারের কাজ। তাঁরা এইসব বিদ্যা সত্যি জানেন কি না কেউ জিজ্ঞাসা করত না। মানুচিরও সেইজন্য কাজ পেতে অসুবিধা হয়নি। অল্পদিনের মধ্যে দারা ও আওরঙ্গজেবের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেল।

আগ্রার কাছে সমুগড়ের যুদ্ধে দারার বড় রকমের হার হল। যুদ্ধের পরে মানুচি সমুগড় থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিছুদিন পরে আবার তিনি সৈন্যদলে ভর্তি হলেন। এবার আওরঙ্গজেবের দলে। আওরঙ্গজেবের সৈন্যদলেও তিনি বেশিদিন ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে আওরঙ্গজেবকে তাঁর পছন্দ হত না। তাঁর সৈন্যদল ছেড়ে দিয়ে মানুচি পুবদিকে পালিয়ে গেলেন। পাটনা পৌঁছে নৌকো

করে রাজমহল এসেছিলেন। সেখান থেকে পূর্ববঙ্গে ঢাকা। আবার সুন্দরবনে ঘুরে হুগলি, হুগলি থেকে কাশিমবাজার, সেখান থেকে সবশেষে আগ্রা। সেনাদলে নাম লেখাবার ইচ্ছা ছিল না। আগ্রায় এসে তিনি ডাক্তার হয়ে ব্যবসা আরম্ভ করলেন। অন্য বিদ্যার মতো ডাক্তারি-বিদ্যা শিখতেও সময় লাগে। কোথা থেকে মানুচি ডাক্তারি শিখেছিলেন জানি না। ডাক্তারিতে তাঁর কিছু পসারও হয়েছিল। সাহেব-ডাক্তারদের চাহিদা ছিল। বাত কিংবা রক্তচাপের রোগীদের চিকিৎসাই ছিল শরীর থেকে খানিকটা রক্ত বের করে দেওয়া। এই কাজ ইউরোপীয়রা ভাল করতেন। কিন্তু বেশিদিন তিনি ডাক্তারও রইলেন না। অম্বরের রাজা জয়সিংহের ছেলে কিরাতসিংহ তাঁকে আবার গোলন্দাজ বাহিনীর সেনাপতি করে নিয়ে এলেন। মাইনে ঠিক হল দিনে দশ টাকা। তখনকার দিনের হিসাবে বেশ ভাল।

রাজপুত সৈন্যদের সঙ্গে তিনি দক্ষিণ ভারতবর্ষে এলেন। তখন ১৬৬৪ সালের মাঝামাঝি। তখন বিদেশীরা অনেক সময় ভারতীয়দের মতো পোশাক পরতেন, মানুচিও তাই। তিনি দাড়ি কামিয়ে ফেলে রাজপুতদের মতো গোঁফ রাখতেন। রাজপুতরা কানে গয়না পরতেন, তিনি পরতেন না। আচকান পরতেন, তার বোতাম আটকাতেন মুসলমানদের মতো করে। তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে জিজ্ঞেস করত, "মানুচি, তুমি হিন্দু না মুসলমান?"

মানুচি বলতেন, "আমি কিছুই নয়, আমি খ্রিস্টান।"

তারা বলত, "সে তো আমরা জানি, কিন্তু তুমি বলো—তুমি হিন্দু-খ্রিস্টান, না মুসলমান-খ্রিস্টান।"

মানুচি খুব রেগে গিয়ে বলতেন, "এদেশের লোক খ্রিস্টান ধর্ম সম্বন্ধে এত কম জানে যে, সে আর বলবার নয়।" সুবিধা পেলে খ্রিস্টান ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। দক্ষিণ ভারতে তখন শিবাজির আধিপত্য। মানুচি একবার শিবাজিকে দেখেছিলেন। সৈন্যদলে আর থাকতে ভাল লাগছিল না তাঁর। মানুচি চাকরি ছেড়ে দিয়ে

বোম্বাইয়ের কাছে বেসিনে চলে এলেন। এটা পর্তুগিজদের এলাকা। কিছুদিন পরে মানুচি আবার বেসিন ছেড়ে লাহোরে ডাক্তার হয়ে বসলেন। ছ-সাত বছর ডাক্তারি করলেন কিন্তু মানুচির টাকা-পয়সার একটু টানাটানি হয়েছিল। ব্যবসায় টাকা খাটাবার চেষ্টা করেছিলেন, তার ফল ভাল হয়নি। তিনি আবার দিল্লি ফিরে গিয়ে ডাক্তারি আরম্ভ করলেন। আওরঙ্গজেবের পুত্র শাহ আলমের বেগমের কানের চিকিৎসা করে তাঁর নাম হয়েছিল। মানুচি বলেছেন যে, তাঁর এত নাম-ডাক আর পসার হয়েছিল যে, দিল্লির ডাক্তাররা তাঁকে দেখতে পারত না। একদিন তিনি রোগী দেখছিলেন, ঘরে রোগীদের ভিড় হয়েছে। এমন সময় কয়েকজন গুণ্ডার মতো লোক এসে গোলমাল করতে আরম্ভ করল, যাতে রোগীরা ভয় পেয়ে অন্য কোথাও চলে যায়।

মানুচি বুঝতে পারলেন যে, এ-সব সাজানো ব্যাপার। অন্য ডাক্তাররা গণ্ডগোল বাধাবার চেষ্টা করছে। তিনি তাঁর লোকদের বললেন, "ধরো ওদের।"

সবাই পালিয়ে গেল তাড়া খেয়ে, কিন্তু একজনকে ধরা গেল। তার হাত-পা বেঁধে ফেলা হল। মানুচি তাকে বললেন, "তোমার ব্যবহারে বোঝাই যাচ্ছে যে, অনেক বদ রক্ত ঢুকেছে, তা বের করে না দিলে নয়।" এই বলে তার শরীর থেকে অনেকটা রক্ত বার করে নিলেন। লোকটি খুব চেঁচাতে লাগল। তারপর বলল, এর শোধ নেবে সে। মানুচি বললেন, "আগে তো বাঁচো, বদ রক্ত বের করে দিই।" এই বলে তার শরীর থেকে অনেক রক্ত মিছিমিছি বার করে নিলেন। তারপর লোকটিকে বললেন, "ভাগ্যিস আজ এসেছিলে, খুব বেঁচে গেলে।"

অত রক্ত বের করে নেওয়া হয়েছিল বলে লোকটি বোধহয় একটু দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। যাবার সময় সে ডাক্তারকে ধন্যবাদ দিয়ে গেল। বলল, তাঁর জন্যই তার প্রাণ রক্ষা হয়েছে।

মানুচিকে বোধহয় আর কখনও এরকম বিপদে পড়তে হয়নি। শাজাহানকে যখন তাজমহলে কবর দিতে নিয়ে যাওয়া হয়, তখনকার ব্যাপার নিয়ে মানুচি একটি গল্প লিখে শুনিয়েছেন।

শাজাহানের মৃতদেহ তাজমহলে নিয়ে আসা হল। সঙ্গে শাজাহানের প্রিয় হাতি ছিল। হাতিটি বাইরে বাঁধা, কিন্তু লক্ষ করছিল কী একটা শোরগোল হচ্ছে, কেন সে বুঝতে পারছে না। এমন সময় মাহুত কাছে এসে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "ওরে তোর আজ দুর্দিন। সম্রাট আর নেই। কে তোর পিঠে চড়বে, তুই তো আর এরকম প্রভু পাবি না?"

হাতি সব কথা বুঝতে পারল। সে শুঁড় দিয়ে ধুলো এনে নিজের দেহে ছড়িয়ে কান্নাকাটি করতে লাগল। তারপর হঠাৎ মাটিতে শুয়ে পড়ল, আর উঠল না। ঘটনাটি বোধহয় সত্যি। মানুচি এরকম অনেক গল্প লিখে গিয়েছেন। দু-চারটি গল্প পরে শোনানো যাবে।

নিকোলাও মানুচির আরও গল্প

নিকোলাও মানুচির প্রায় চারশো বছর আগে মার্কো পোলো এ-দেশে বেড়াতে এসেছিলেন। তিনিও মানুচির মতো ইটালির লোক, ভেনিসে বাড়ি। তিনি পৃথিবীর অনেক জায়গা ঘুরে দেশে ফিরে গিয়ে তাঁর ভ্রমণকাহিনী লিখেছিলেন। প্রথম প্রথম দেশের লোক তাঁর কথা হেসে উড়িয়ে দিত, কেউ বিশ্বাস করত না। বলত, লোকটা বাহাদুর বটে। এত মজার-মজার আর আজগুবি গল্প বানিয়ে লিখেছে। পরে অবশ্য তাদের এ-ভুল ভেঙেছিল। মানুচিকে এ-রকম কথা অবশ্য কেউ বলেনি। তাঁর লেখা মোগল সাম্রাজ্যের কাহিনী অনেক পরে উইলিয়ম আরভিন চেষ্টা করে বার করেছিলেন। সে ঊনবিংশ শতাব্দীর কথা। উইলিয়ম আরভিন ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে কাজ করতেন, কিন্তু তাঁর খ্যাতি মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাসকার বলে। মানুচি আওরঙ্গজেবের সময়কার কাহিনী লিখেছেন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর দশ বছর পরে তিনি মারা যান। অন্য পর্যটকদের মতো তিনি আর দেশে ফিরে যাননি, শেষ জীবন মাদ্রাজে কাটিয়েছিলেন।

মানুচি অনেক পর্যটকদের চাইতে সাবধানী লেখক, সাধারণত একটু ভেবেচিন্তে বিবেচনা করে লিখতেন। তিনি তাঁর কালের

একজন খুব নামজাদা ফরাসি পর্যটককে পরিহাস করে বলেছিলেন, রাস্তায় শোনা যে-কোনো গল্পগুজবকে বিশ্বাস করে ইতিহাস লেখা উচিত নয়। তাতে অনেক ভুল থাকতে পারে। কিন্তু মানুচির সব কথা বিশ্বাস করা কঠিন। অনেক অদ্ভুত গল্প তিনি নিজেও তাঁর লেখায় ঠাঁই দিয়েছেন, যেমন, ভূতে ধরার গল্প, জাদুকরদের শূন্যে হাত বাড়িয়ে নানারকম ফল নিয়ে আসার গল্প। তাঁর একটি কাহিনীতে আছে যে, তিনি আওরঙ্গজেবের এক বিখ্যাত কর্মচারীর আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন। গিয়ে দেখলেন, তাঁর একটি পোষা জাদুকর সেখানে বসে আছে। সে শূন্যে হাত বাড়িয়ে নানারকম ফল এনে দিল। সে-সব ফল সে-অঞ্চলে জন্মায় না। মানুচি কিন্তু এই ফল খেতে রাজি হননি। তাঁর মনে হয়েছিল, কী জানি জাদুর ফল, খেয়ে আবার কী বিপত্তি হবে—সুতরাং খেয়ে কাজ নেই।

মানুচি নিজে অনেক সময় ডাক্তারি করেছেন। তাঁর পসারও ভাল ছিল। কিন্তু তিনি এমন কিছু কিছু ওষুধের কথা লিখেছেন যা এখনকার ডাক্তাররা পরীক্ষা করতে রজি হবেন না। তাঁর বিশ্বাস ছিল, পাগলা কুকুরে কামড়ালে সমুদ্রযাত্রায় অসুখ সেরে যাবে।

মানুচি শাজাহানের রাজত্বকালে দু'একটি বিচারের কথা লিখেছেন। এগুলি মানুচির মতে ন্যায়বিচারের এবং বুদ্ধির নিদর্শন। এ-রকম কয়েকটি ঘটনার কথা বলছি। একটি ঘটনা এইরকম। দপ্তরের এক কেরানি নালিশ করেছিল যে, তার একজন পুরনো দাসীকে একজন সৈন্য জোর করে নিয়ে গিয়েছে। দাসীটি বলতে লাগল যে, সে কেরানিটিকে চেনেই না, কখনও তার বাড়িতে কাজ করেনি। সমস্ত জিনিসটাই মিথ্যা। নীচের আদালত ব্যাপারটি ধরতে না পেরে সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সম্রাট বললেন "এই কথা! আচ্ছা, দাসীটি এসে কয়েকদিন আমার প্রাসাদে থাকুক।" সম্রাট একদিন লিখতে লিখতে দেখলেন যে দোয়াতের কালি ফুরিয়ে
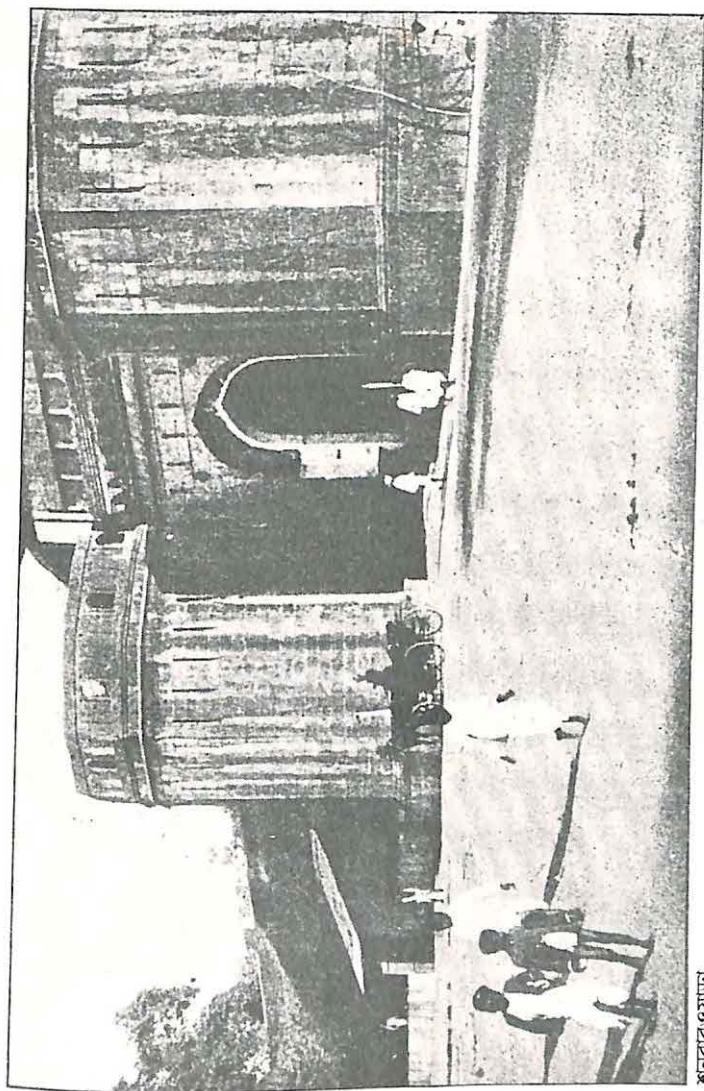
শনবারওয়াড়া

নিকোলাও মানুচি

নানাসাহেব

নানাসাহেব ভেবে যাঁকে ভুল করে ধরা হয়

গিয়েছে। দাসীটিকে বললেন, "দ্যাখো তো নতুন কালি বানাতে পারো কি না।" সে-আমলে কেরানিরা লেখার কালি নিজেরাই বাড়িতে তৈরি করে নিত। মেয়েটি খুব সন্দর করে দোয়াতে নতুন কালি বানিয়ে দিল। সম্রাট দেখে বললেন, "তবে রে মিথ্যেবাদী, তুই নিশ্চয় কেরানিটির বাড়িতে কাজ করতিস, নাহলে এ-রকম কালি বানাতে শিখলি কী করে?" আদালতকে হুকুম দেওয়া হল যে, দাসীটিকে কেরানির বাড়িতেই পাঠানো হোক, আর সৈনিকটিকে যেন এখনই কাজ থেকে বরখাস্ত করা হয়।

আর একটি গল্প বলছি। চার সওদাগর মিলে এক দোকান খুলেছিল। প্রত্যেকেরই দোকানের সমান ভাগ। ঠিক হল তারা পালা করে দোকানে বসবে আর সেদিনকার দোকানের তেলের খরচ দেবে। দোকানে একটি পোষা বেড়াল ছিল, তার দুধের খরচও জোগাবে। বেড়ালটি যদি মরে যায় তাহলে সেদিন যে দোকানে থাকবে তাকে নতুন বেড়াল কেনার খরচ দিতে হবে। একদিন দেখা গেল বেড়ালটির একটা পা ভেঙে গিয়েছে। সেদিন যার পালা সেই সওদাগর বেড়ালের চিকিৎসার ব্যবস্থা করল। তার ভাঙা পা মলম দিয়ে বেঁধে রাখা হল। অন্য তিনজন সওদাগরকে বলা হল যে, বেড়ালের চিকিৎসার জন্য যে খরচ হচ্ছে তার জন্য তাদেরও ভাগের টাকা দেওয়া উচিত। তারা বলল যে, এ হতেই পারে না। অন্য সওদাগররা নালিশ করল যে, যেদিন বেড়ালের পা ভাঙে সেদিন যার পালা ছিল তাকেই খরচ দিতে হবে। ইতিমধ্যে বেড়ালটি ভাঙা পা নিয়ে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে প্রদীপের কাছে বসেছে। প্রদীপের আগুন থেকে তার খোঁড়া পায়ের ব্যাণ্ডেজে আগুন লেগে গেল। ভয় পেয়ে ছুটোছুটি করতে করতে বেড়ালটি দোকানের জিনিসপত্রের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ফলে আগুন ছড়িয়ে পড়ল আর দেকানটি দেখতে দেখতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আদালতে এ নিয়ে মামলা হল কিন্তু ফয়সালা করা গেল না। মামলাটি শেষ পর্যন্ত সম্রাট শাহজাহানের

কাছে পাঠানো হল। সম্রাট কাগজপত্র দেখে রায় দিলেন যে, যেদিন বেড়ালটি খোঁড়া হয় সেদিন দোকানে যে ছিল তার কোনো দোষ নেই, বাকি তিনজনকে সমস্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যার পালার দিন বেড়ালটির পা খোঁড়া হয়েছিল তার কোনো অপরাধ নেই। সে তো বেড়ালটির চিকিৎসাই করছে। আর খোঁড়া পায়ের ওপর ভর দিয়ে বেড়ালটি লাফালাফি করতে পারে না। যে তিনটি পা ভাল ছিল সেই তিন পা দিয়েই সে লাফিয়েছে। কাজেই ক্ষতিপূরণ অন্য তিনজন সওদাগরকেই দিতে হবে।

আরও একটি গল্প বলছি। এই ধরনের গল্প পরে একাধিক জায়গায় প্রচলিত হয়েছে। কাজেই সবার কাছে নতুন মনে নাও হতে পারে। সবাই জানে যে, সম্রাট শাহজাহান নাচগানের ভক্ত ছিলেন। হয়তো একটু বেশিই ছিলেন। তাঁর সভায় গুণীদের খুব আদর ছিল। মানুচির কথা ঠিক হলে বিশ্বাস করতে হয় যে, গাইয়ে-বাজিয়েদের মধ্যে যাঁরা একটু ভাঁড়ামি করতে পারতেন তাঁদের কদরই বেশি ছিল। যাঁরা সভায় গাইতে কি বাজাতে আসতেন তাঁদের কাছ থেকে দেউড়ির পঁচিশজন সেপাই নিয়মিত বকশিশ চাইত। নইলে ঢুকতে দেবে না বলে ভয় দেখাত। একদিন এক ওস্তাদ এলেন। ওস্তাদকে ঢুকবার সময় সেপাইরা খুব বাধা দিল। তিনি বললেন, "আচ্ছা, বাবাসকল, যা পাই ফেরবার সময় তোদের ভাগ করে দিয়ে যাব।"

ওস্তাদের গানে শাহজাহানের মন ভিজে গেল। তিনি বললেন, "ওস্তাদজি, আমি খুব খুশি হয়েছি। কী চাই বলুন ?"

ওস্তাদ বললেন, "যদি খুশি হয়ে থাকেন তাহলে আমার একটি প্রার্থনা আছে।"

সম্রাট বললেন, "কী, বলুন ?"

ওস্তাদ উত্তর দিলেন, "একহাজার কোড়ার ঘা।"

সম্রাট বললেন, "সে কী কথা ! এরকম পুরস্কার চাইছেন কেন ?"

ওস্তাদ উত্তর দিলেন, "না চেয়ে উপায় কী ? প্রত্যেকদিন এখানে

ঢুকবার সময় আপনার সেপাইরা জ্বালাতন করে। বলে, বকশিশ না পেলে ঢুকতে দেব না। আজ বলে এসেছি, যা পাব তোদের সব দেব।" শাহজাহান শুনে একটু হাসলেন। বললেন, "তাই হোক।" তারপর সেই পঁচিশজন সেপাইকে ডেকে এক হাজার কোড়ার ঘা তাদের ভাগ করে দেওয়া হল। ওস্তাদজিকে শুধু হাতে ফিরে যেতে হয়নি। তিনি সম্রাটের কাছ থেকে এক হাজার আশরফি পেলেন তাঁর গানের জন্যে, আর একটি ঘোড়া তাঁর বুদ্ধির জন্যে।

সম্রাট হবার পর আওরঙ্গজেবের খুব শখ হয়েছিল যে, তিনি একটি নৌবাহিনী তৈরি করবেন। দিল্লি বা আগ্রা যদি সমুদ্রের খুব কাছে হত তাহলে নৌবাহিনী আপনা থেকেই তৈরি হয়ে যেত, যেমন ইউরোপে ইংরেজ, ফরাসি ও পর্তুগিজদের দেশে। আমাদের দেশের লোকদের বড় নৌবাহিনী ছিল না। একমাত্র বোম্বাইয়ের কাছে জঞ্জিরা দ্বীপে আবিসিনিয়ানদের যুদ্ধজাহাজ ছিল। কাছেই শিবাজির রাজ্য। শিবাজি নিজের নৌবাহিনী তৈরি করেছিলেন এইসব আবিসিনিয়ানদের সাহায্যে। তাঁরা বড় নৌকর্মচারীর পদ পেতেন। শিবাজি তাঁর নৌবাহিনীতে পর্তুগিজদেরও নিতেন। আওরঙ্গজেবের এ-রকম নৌবাহিনী তৈরি করা সম্ভব ছিল না। জঞ্জিরা তাঁর সাম্রাজ্য থেকে অনেক দূরে। পর্তুগিজরা তাঁর শত্রু। কাছাকাছি সমুদ্র না থাকলে নৌবাহিনী কোথায় যুদ্ধ করবে ? তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা হল যে, নৌবাহিনীর কাজ ভারতীয়দের দিয়ে ভাল হবে না, বিদেশীদের রাখতে হবে। সেটা কি উচিত ? আওরঙ্গজেবও কম জেদি ছিলেন না, তিনি রাজি হলেন না। অবশেষে একটি ছোট জাহাজ তৈরি করে একটি দিঘিতে ভাসানো হল। তাতে কামান ও অন্যান্য যুদ্ধের সরঞ্জাম বসানো ছিল। আওরঙ্গজেব দেখতে লাগলেন কী করে জাহাজটি চালানো হচ্ছে। জাহাজটি সহজে এদিক-ওদিক ঘুরছিল। জাহাজ থেকে চারদিকে আক্রমণের ব্যবস্থা। তিনি সব দেখেশুনে বললেন,"না বাপু এ-সব এ-দেশের লোক দিয়ে হবে না। এ-সব

ফিরিঙ্গিদেরই মানায় ।" মোগল নৌবাহিনীর কথা চাপা পড়ে গেল ।

ঐতিহাসিকরা যে মানুচিকে উঁচু স্থান দেন তার প্রধান কারণ কিন্তু এইসব গল্পগাছা নয় । তখনকার মোগল সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক কাহিনী, শাহজাহানের ছেলেদের মধ্যে যুদ্ধ, শাহজাহানের শেষ জীবনের বর্ণনা এবং মোগল দরবারের কথা তিনি যা লিখেছেন তার তুলনা পাওয়া কঠিন । এই সময়কার ইতিহাস জানতে গেলে বারে বারে মানুচির শরণাপন্ন হতে হয় ।

মোগল-দরবারে ইংরেজ ডাক্তার

৪ জুলাই, ১৭১৫সাল। দিল্লি শহরের বাইরে হুমায়ুনের সমাধির কাছে বাদশাহ ফররুখশিয়ারের একজন কর্মচারী ২০০০ সৈন্য ও দুটি হাতি নিয়ে সকাল থেকে অপেক্ষা করছিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কলকাতা থেকে বাদশাহর কাছে দরবার করবার জন্য একটি ছোট দল পাঠিয়েছিলেন। সেই দলের সেদিন দিল্লি পৌঁছবার কথা। ইংরেজদের ইচ্ছা ছিল, তাদের যেন ভাল করে অভ্যর্থনা করা হয়, এবং ধুমধাম করে শহরের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তারা যেন ধুলোপায়ে বাদশাহর সঙ্গে দেখা করতে পারে। বাদশাহর সঙ্গে দেখা করে তারা যে যার থাকবার জায়গায় চলে যাবে।

ইংরেজদের তো বাজনা-টাজনা বাজিয়ে, শোভাযাত্রা করে দিল্লির লালকেল্লায় নিয়ে যাওয়া হল। পৌঁছতে বেলা প্রায় দুপুর। দরবারে ইংরেজরা বাদশাহর কাছে কলকাতার গভর্নরের চিঠি পেশ করলেন, ১০০১ মোহর নজরানা দিলেন। তার সঙ্গে আরও অনেক উপঢৌকন। ভালয় ভালয় ইংরেজরা কাজ আরম্ভ করলেন বটে, কিন্তু গোড়ায় গলদ ছিল, তাই শেষ রক্ষা হতে দেরি হল। সে-কথা বুঝতে হলে আগেকার কিছু ঘটনা জানা দরকার।

বাদশাহ আওরঙ্গজেব ১৭০৭ সালে মারা গেলেন। ইংরেজরা তখন

অনেকটা গুছিয়ে বসেছে। সম্পত্তি রক্ষা করতে গেলেই দুর্গ গড়তে হয়। দুর্গ রাখতে হলে অনেক টাকা খরচ। সে-টাকা কোথা থেকে আসবে ? তখন নতুন ব্যবসা। লাভও করব, এত খরচও করব, তা সম্ভব নয়। একটা বাড়তি উপায়ের ব্যবস্থা করা দরকার। বাড়তি টাকা আসতে পারে, যদি দুর্গের কাছে অনেকটা জমি পাওয়া যায়। তার জন্য দিল্লির বাদশাহর অনুমতি দরকার। সুবে বাংলায় একজন শাসনকর্তা অবশ্যই ছিলেন, মুর্শিদকুলি খাঁ। তাঁকে ইংরেজদের বন্ধু বলে চলে না। পরস্পরকে তাঁরা সন্দেহের চোখে দেখতেন।

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর তিন বছরের মধ্যে ইংরেজরা এ নিয়ে কথা শুরু করে ; কিন্তু কাজ তখনও কিছু এগোয়নি। বাহাদুর শাহর পরে তাঁর বড় ছেলে জাহান্দার শাহ্ সম্রাট হয়েছিলেন। জাহান্দার শাহ্ কিন্তু ঠিক বাদশাহ হবার উপযুক্ত লোক ছিলেন না। এক বছরেই তাঁর রাজত্ব শেষ হয়ে গেল। তারপর জাহান্দার শাহর ভাই আজিম-উস্-সানের ছেলে ফররুখশিয়ার সম্রাট হলেন। তিনিও কোনো কোনো বিষয়ে একটু অদ্ভুত ছিলেন। তিনি ও তাঁর বাবা, দুজনেই ইংরেজদের পছন্দ করতেন। ফররুখশিয়ার বিলিতি খেলনা ভালবাসতেন। বড় হয়েও ফররুখশিয়ার খেলনার লোভ ছাড়তে পারেননি। ইংরেজদের মনে হয়েছিল, অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে সম্রাটকে কিছু বিলিতি খেলনা উপহার দিলে কাজের সুবিধা হতে পারে। ফররুখশিয়ারের রাজত্বের প্রথম দিক থেকে দিল্লিতে লোক পাঠাবার তোড়জোড় হচ্ছিল। মুর্শিদকুলি খাঁ এ ব্যাপার পছন্দ করছিলেন না। ইংরেজরা দিল্লি থেকে বাদশাহর হুকুম আনালেন যে, মুর্শিদকুলি খাঁ যেন কোনোভাবে তাঁদের বাধা না দেন।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষ থেকে দিল্লিতে কাদের পাঠানো হবে, তাই নিয়ে কিছু আলোচনা চলছিল। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, যাঁরা কাউন্সিলের সদস্য, তাঁদের না-পাঠানোই ভাল। কে জানে, বাদশাহ কিংবা তাঁর ওমরাহরা তাঁদের সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করবেন। শেষ

পর্যন্ত যাঁদের পাঠানো হল, তাঁদের নাম জন্ সারমন, এডওয়ার্ড স্টিফেনসন, হিউ বারকার ও ডাক্তার উইলিয়াম হ্যামিলটন। এঁদের মধ্যে জন্ সারমন এই দলের নেতৃত্ব করেন। কিন্তু দেখা গেল, ডাক্তার হ্যামিলটনকে দিয়েই কোম্পানির কাজ হয়েছে।

দরখাস্ত পেশ করতে হলে রীতি হচ্ছে উপযুক্ত মানের উপহার দিতে হয়। কোম্পানি অনেক ভেবে বাদশাহকে যে উপহার দেবেন ঠিক করেছিলেন, তার দাম এক লাখ দু' হাজার টাকার কিছু বেশি। দরবারের ওমরাহদের জন্য যেসব জিনিসপত্র সঙ্গে নেওয়া হল, তার দামও এক লাখ আট হাজার টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া সারমন ও সঙ্গীদের খরচের জন্য প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা ধরা হয়েছিল। এই দলের সঙ্গে কিছু কাপড়চোপড় পাঠানো হল, যা বিক্রি করে কিছু টাকা পাওয়া যেতে পারে। পথ-খরচার টাকার অভাব হবে না।

ইংরেজরা বাদশাহর দরবারের আদব-কায়দা ভাল করে জানতেন না। সেখানে সত্যিকারের কিছু ক্ষমতা ছিল যাঁদের, তাঁরা দুই ভাই, আবদাল্লা আর হুসেন। সমস্ত দরখাস্ত পেশ করতে হত উজির আবদাল্লা খানের কাছে। তাঁর বদলে ইংরেজরা যাঁর কাছে দরখাস্ত পেশ করেছিলেন, তাঁর বিশেষ কোনো ক্ষমতা ছিল না। ইতিমধ্যে আর-এক বিপদ উপস্থিত হল। বাদশাহ ফররুখশিয়ারের স্বাস্থ্য কোনোদিনই ভাল ছিল না। এই সময়েই তিনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বাদশাহর বিয়ের দিন ঠিক হয়েছিল, কিন্তু অসুখের জন্য সে-তারিখ পিছিয়ে যেতে লাগল। দরবারের হাকিমরা কিছুই করতে পারলেন না। শেষে ওমরাহদের একজন বললেন, ইংরেজদের সঙ্গে তো একজন ডাক্তার আছে, তাকে দিয়েই বাদশাহর চিকিৎসা করানো যাক। এ-ব্যবস্থাও সবার ভাল লাগেনি। ইংরেজদের চিকিৎসায় বাদশাহর অসুখ সত্যি যদি সেরে যায়, তাহলে হাকিমরা তো মুখ দেখাতে পারবে না। একজন আবার বললেন যে, আগে একজন বড়

কর্মচারীকে ওষুধ খাইয়ে দেখা যাক কী হয়। যাঁর নাম করা হল, তিনি বাদশাহর খান-ই-সামান। তিনি কিছুতেই ওষুধ খেতে রাজি হলেন না। যার অসুখ করেনি, তাকে ওষুধ খাইয়েই বা কী বোঝা যাবে ? অবশেষে ডাক্তার হ্যামিলটনকে ডাকা হল। তাঁর চিকিৎসায় বাদশাহ ধীরে ধীরে ভাল হয়ে উঠলেন, কিন্তু ঠিক সেরে উঠতে মাস-দুই লাগল। তখন আবার বিয়ের ধুম লেগে গেল। ইংরেজরা আর বাদশাহর নাগাল পান না।

ইংরেজরা প্রথমে বুঝতে পারেননি যে, বাদশাহর কাছে দরখাস্ত পাঠাতে হলে ঠিক লোকের হাতে দিতে হয়। সেই লোক বাদশাহর উজির। দরখাস্ত প্রথম পাঠানো হয়েছিল ১৭১৫ সালের আগস্ট মাসে। ইংরেজরা যা প্রার্থনা করেছিলেন, তা মোটামুটি এই : পূর্বে ইংরেজদের যেসব সুবিধা দেওয়া হয়েছিল সেগুলি যেন বজায় থাকে। অর্থাৎ বাংলা বিহার ও ওড়িশায় তাঁরা যেন অবাধে বাণিজ্য করতে পারেন। তার জন্য নামমাত্র কর দিলেই চলবে। তিনটি গ্রাম—সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা তাঁরা খাজনা দিয়ে ভোগ করতে পারবেন। এ দুটি পুরনো ব্যাপার। এই সুবিধা ইংরেজদের দেওয়াই হয়েছিল, কিন্তু বাদশাহর কাছ থেকে ফরমান পেলে ব্যাপারটা আরও পোক্ত হয়। ইংরেজরা নতুন করে চাইলেন, যেন এই তিনটি গ্রামের মতো কলকাতার কাছে আরও ৩৮টি গ্রাম তাঁদের এইরকম শর্তে দেওয়া হয়। তা ছাড়া চাওয়া হল পাটনার ফ্যাক্টরির জন্য ১৩ একর জমি।

আরও প্রস্তাব ছিল। কলকাতার নাম বদলে ফররুখ-বন্দর রাখা হবে, আর ৩৮টি গ্রাম ইংরেজদের দিলে তাঁরা তার সঙ্গে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতাকে যোগ করে গোটা এলাকাকে ফররুখাবাদ নাম দেবেন। বোধহয় মনে করা হয়েছিল, এইসব প্রস্তাবে বাদশাহ খুশি হবেন। কিন্তু কলকাতার নাম বদলে ফররুখ-বন্দর করা কিংবা ফররুখাবাদ নামে একটি আলাদা পরগনা করার প্রস্তাবে বাদশাহ

রাজি হলেন না। ভাবলেন, এতে পরে অনেক অসুবিধা হতে পারে। ইংরেজরা আশা করেছিলেন যে, বাদশাহ দরখাস্ত হাতে পেলেই ফরমান জারি করে দেবেন। তা কিন্তু হল না।

পরের বছর জানুয়ারি মাসের শেষে ইংরেজরা আর-একটি দরখাস্ত করলেন। দ্বিতীয় দরখাস্তে দুটি নতুন প্রার্থনা ছিল। একটি হচ্ছে ইংরেজদের যেন বোম্বাইতে একটি টাঁকশাল করতে দেওয়া হয়। আর একটিতে বলা হয়েছিল যে, কলকাতায় দুর্বৃত্তরা এসে খুব উপদ্রব করে, তাদের যেন দমন করবার ব্যবস্থা হয়। প্রায় তিন মাস অপেক্ষা করার পর মার্চ মাসে ইংরেজদের দ্বিতীয় দরখাস্ত ফেরত দেওয়া হল। বলা হল, ওটা উজিরের হাত দিয়ে আসা উচিত, নাহলে কিছু করা যাবে না। পরের বছর ইংরেজরা উজিরের হাত দিয়ে তৃতীয় দরখাস্ত পাঠালেন। এবার তাড়াতাড়ি কাজ হতে লাগল। বাদশাহকে বলা হয়েছিল যে, ইংরেজরা বিরক্ত হয়ে সুরাটের ব্যবসা ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে পারেন। ইংরেজদের সুরাটের ব্যবসায় বাদশাহের বেশ লাভ হত। অবশেষে ১৭১৭ সালে বাদশাহ ফরমান জারি করলেন। সেই ফরমানে বাদশাহের মোহরের ছাপ পড়ল। তারপর উজিরের মোহর পড়ল। কিন্তু মে মাসের আগে ইংরেজরা দিল্লি ছাড়তে পারলেন না। ইতিমধ্যেই দু পক্ষের কিছু উপহার দেওয়া-নেওয়া হয়েছিল। ফররুখশিয়ার খুব ভালবাসতেন ঘোড়া। তিনি সারমনকে অন্য জিনিসের সঙ্গে একটি ঘোড়া উপহার দিলেন। শেষ মুহূর্তে আবার একটি বিপদ ঘটতে পারত। বাদশাহকে কেউ কেউ বুঝিয়েছিলেন যে, ডাক্তার তো ফিরে যাবেন, সেক্ষেত্রে ভবিষ্যতে বাদশাহর আবার অসুখ হলে কী হবে ? ডাক্তার হ্যামিলটনকে রেখে দেওয়া হোক। ডাক্তার হ্যামিলটন এই বলে ছাড়া পান যে, তিনি বিলেত গিয়ে স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে দেখা করবেন। তারপর বাদশাহর জন্য ভাল ওষুধ যোগাড় করে পাঠাবেন। এর পর বাদশাহ আর আপত্তি করলেন না।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে যে ফরমান দেওয়া হয়েছে, এ খবর আগেই কলকাতায় পাঠানো হয়েছিল। কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ও চারজন সদস্য কলকাতা থেকে কিছু দূরে ত্রিবেণীতে এসে সারমন ও তাঁর সঙ্গীদের অভ্যর্থনা করলেন। সারমন যে-সব প্রার্থনা করেছিলেন, তার সব বাদশাহ মঞ্জুর করেননি। কিন্তু অনেকগুলি করেছিলেন। ইংরেজরা আগেকার মতো বাংলা, বিহার ও ওড়িশায় ব্যবসা করতে পারবে। তার জন্য তিন হাজার টাকা ছাড়া আর কিছু দিতে হবে না। কলকাতার চারদিকে তাদের অনেকটা জায়গা দেওয়া হল। হায়দরাবাদেও আগেকার মতন ব্যবসা চলবে। যা কর তারা দিত, শুধু তাই দিতে হবে। সুরাটে সবরকম কর ও মাশুলের বদলে বছরে তারা ১০ হাজার টাকা দেবে। বোম্বাইতে টাঁকশালে যে টাকা ছাপা হবে, তা সাম্রাজ্যের সব জায়গায় চলবে।

একশো বছর আগে জাহাঙ্গিরের আমল থেকে ইংরেজরা ব্যবসা করবার অনুমতি ও নানারকম সুবিধা খুঁজছিল। কিন্তু বাদশারা যা-ই বলুন না কেন, তখন যাঁরা প্রদেশের সুবেদার ছিলেন, তাঁদের উপরে অনেকটা নির্ভর করত। সুবেদারের হাত শক্ত থাকলে তাঁরা বিদেশীদের অনেকভাবে বাধা দিতে পারতেন। দিল্লি অনেক দূরের পথ। তা ছাড়া দিল্লির বাদশাহের সিংহাসন এত টলমল করত যে, সুবেদারকে চটিয়ে ইংরেজদের কোনো লাভ হত না। পলাশির যুদ্ধে জিতে ইংরেজদের অনেক সুবিধা হল বটে, কিন্তু ইংরেজদের সঙ্গে বাংলার নবাবের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে বিরোধ আরও কয়েক বছর ধরে লেগেই রইল। তার অনেক আগেই ফররুখশিয়ারের মৃত্যু হয়েছে। পরে যাঁরা বাদশা হলেন, তাঁদের শাসন তো নামেমাত্র শাসন। তাঁদের মর্জিমতন কাজ-কারবার করার কোনো দরকারই ইংরেজদের ছিল না।

'ধ' চ 'ম' কওন কেলা ?

১৭৬১ সালের ১৪ই জানুয়ারি বিকেল। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। আহমদ শাহ আবদালি জিতলেন, মারাঠাদের সর্বনাশ হল। তৃতীয় পেশোয়া বালাজি বাজীরাওয়ের শরীর খারাপ। তিনি যুদ্ধে যাননি, পুনায় ছিলেন। মারাঠিরা বলেন 'পুনে'। কয়েকদিন পরে তাঁর কাছে যুদ্ধের চিঠি নিয়ে খবর এল। সে-চিঠি সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা। "দুটি মুক্তো গলে গিয়েছে, বাইশটি মোহর হারিয়েছে। রুপো ও তামা যে কত গিয়েছে, তার হিসেব নেই।" দুটি মুক্তো মানে পেশোয়ার বড় ছেলে বিশ্বাস রাও, যিনি বেঁচে থাকলে পেশোয়া হতেন। আর-একটি মুক্তো সেনাপতি সদাশিব রাও। বাইশটি মোহর হচ্ছেন নামকরা সেনাপতিরা। এ ছাড়া পেশোয়া হারিয়েছিলেন পাঁচশো হাতি, পঞ্চাশ হাজার ঘোড়া, কয়েক হাজার উট। সবই দামি জিনিস, কিন্তু পেশোয়ার সে-কথা ভাববার অবসর ছিল না। তিনি এই বিপত্তির খবর সহ্য করতে পারলেন না, অল্পদিনের মধ্যেই মারা গেলেন।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দুজন যুবক পালিয়ে এসেছিলেন। না-এলে আরও সর্বনাশ হত। এই দুজন অনেকদিন পর্যন্ত বিদেশীদের ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন ; শত্রু ছিল দেশবাসীদের মধ্যেও। তাদেরও

তাঁরা ঠেকান। এই দুজনের একজনের নাম নানা ফাড়নবিস, তিনি যোদ্ধা ছিলেন না, দপ্তরে কাজ করতেন। পরে মারাঠা রাজ্যের সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিলেন। আর-একজনের নাম মহাদজি সিন্ধিয়া। তিনি গোয়ালিয়রের লোক। ইংরেজরাও পরে এই দুজনকে সমীহ করে চলত।

পেশোয়ার মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয় ছেলে মাধব রাও পেশোয়া হলেন। দশ বছর তিনি পেশোয়া ছিলেন। অনেকে বিশ্বাস করেন, মহারাষ্ট্রে যত পেশোয়া হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ। বেঁচে থাকলে তিনি মারাঠা রাজ্যগুলিকে হয়তো এক করতে পারতেন। দেশের অনেক উপকার হত। কিন্তু তা হবার নয়। কয়েক বছর ধরে মাধব রাওয়ের শরীর খারাপ হচ্ছিল। ১৭৭২ সালের নভেম্বর মাসে তাঁর জীবন শেষ হয়ে গেল। মৃত্যুর আগে তিনি বলে গিয়েছিলেন যেন তাঁর ছোট ভাই নারায়ণ রাওকে পেশোয়া করা হয়।

পেশোয়া পদের জন্য আর কি কেউ দাবিদার ছিলেন না ? ছিলেন বালাজি বাজীরাওয়ের ছোট ভাই, অর্থাৎ নারায়ণ রাওয়ের কাকা রঘুনাথ রাও। পেশোয়ার আসনের উপরে তাঁর দারুণ লোভ ছিল। এমন খারাপ কাজ নেই, পেশোয়া হবার জন্য যা তিনি করতে পারতেন না। কিছুদিন তাঁকে বন্দী করেও রাখা হয়েছিল। আস্তে আস্তে তাঁর বন্দী-দশা শিথিল হয়ে এল। পানিপথের যুদ্ধ যখন হচ্ছে, তখন নারায়ণ রাও যে প্রাসাদে থাকতেন সেই প্রাসাদে তাঁরও থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। এর ফল ভাল হয়নি।

নতুন পেশোয়া নারায়ণ রাওয়ের বয়স বেশি নয়, মাত্র সতেরো বছর। কিন্তু সেই সময় সতেরো বছরকে খুব কম বয়স ভাবা হত না। অল্প বয়সে কেউ কেউ রাজ্যও চালিয়েছেন ভাল করে। তাঁদের মন্ত্রীরা অবশ্য খুব দক্ষ ছিলেন। তখন পুনেতে যিনি প্রায় প্রধানমন্ত্রী হয়ে উঠেছিলেন, রাজ্য চালাবার ক্ষমতা সেই নানা ফাড়নবিসেরও ছিল অসামান্য। নারায়ণ রাও নিজে কিন্তু খুব চৌকস পেশোয়া

ছিলেন বলে মনে হয় না। তার মন সতেরো বছরের তরুণের মতো গড়ে ওঠেনি, তার চেয়ে অনেক কম বয়সের ছেলের মতো ছিল। ব্রাহ্মণের ছেলেকে কিছু সংস্কৃত জানতেই হত। তিনি অন্য লেখাপড়াও কিছু-কিছু করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ব্যবহার ঠিক পেশোয়া বংশের ছেলের মতো ছিল না। হাসি-তামাশা কিছু দোষের নয়, যদি মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়। কিন্তু নারায়ণ রাওয়ের সে-কথা বুঝবার ক্ষমতা ছিল না।

পুনে নগরে পেশোয়াদের কয়েকটি প্রাসাদ ছিল। বাড়ির নাম সপ্তাহের একটি দিনের নামে রাখা হত। পেশোয়া ও তাঁর কাকা যে বাড়িতে থাকতেন, তার নাম শন্‌বারওয়াড়া। ইংরেজিতে অনুবাদ করলে দাঁড়াবে স্যাটারডে প্যালেস। সেইরকম আর-একটি প্রাসাদের নাম বুধবারওয়াড়া। শন্‌বারওয়াড়াই সবচেয়ে বড় প্রাসাদ। কিন্তু দিল্লি, আগ্রা, ফতেপুরসিক্রি যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের কাছে এসব প্রাসাদ চোখে লাগবে না।

বাড়িটি দোতলা। উপরে উঠবার সিঁড়ি খুব সংকীর্ণ। পাছে আক্রমণ হয়, সেই ভয়ে এই সতর্কতা। সরু সিঁড়িতে অল্পলোকই বেশি লোককে ঠেকাতে পারত। সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলার বারান্দা, সেও প্রশস্ত নয়। বারান্দার পাশে সারি-সারি থাকবার ঘর। বারান্দা থেকে দু'এক ধাপ উঠে ঘরে ঢুকতে হয়। এই বাড়ির দোতলায় ১৭৭৩ সালের ৩০ আগস্ট তারিখে দুপুরবেলা এক বিষম কাণ্ড ঘটে গেল।

অনেকদিন থেকে পেশোয়ার সৈন্যদলে গর্দি বলে এক বিশেষ শ্রেণী থাকত। আরব, খ্রিস্টান সব সম্প্রদায়ের লোকই এতে যোগ দিত। শিবাজির সময়েও তাঁর সৈন্যদের মধ্যে কিছু বিদেশী লোক রাখা হত। সমুদ্রে জাহাজ চালাতে, কামান বন্দুক ছুঁড়তে এদের জুড়ি ছিল না। এদের মাইনেও সাধারণ মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যদের চেয়ে কিছু বেশি হত। মাইনে বেশি হলে কী হবে, সে-টাকা নিয়মমত তারা

পেত না। পেশোয়া নারায়ণ রাওয়ের আগে থেকেই তাদের মাইনে অনেক বাকি পড়েছিল। নারায়ণ রাওয়ের আগে যিনি পেশোয়া ছিলেন সেই মাধব রাও তো রাজ্য শাসনের খরচ মেটাতে গিয়ে প্রায় ফতুর হয়ে পড়েছিলেন। বিদেশী সৈন্যরা ভাল যুদ্ধ করত বটে কিন্তু তাদের এ-দেশের প্রতি কোনো মমতা থাকবার কথা নয়। এ অবস্থা যে শুধু আমাদের দেশেই ছিল, তা নয়, ইউরোপের অনেক দেশে আগে এ রকম দল ছিল। গর্দিরা বাকি টাকার জন্য মাঝে মাঝে গোলমাল করছিল, কিন্তু সে তো অনেক সময়েই হয়। রাজ্যের কত সমস্যা থাকে। সব সময় সব দিকে খবরদারি করা সম্ভব হত না।

যেদিন দুপুরের কথা বলছি, সেদিন সকালবেলা রঘুজি আংরে বলে একজন নৌ-সেনাপতি পেশোয়ার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তিনি গুজব শুনেছিলেন যে, নারায়ণ রাওকে খুন করবার ষড়যন্ত্র চলছে। পেশোয়াকে রঘুজি বললেন, তিনি যেন সাবধানে থাকেন। এরপর পেশোয়া নারায়ণ রাও ও তাঁর বিশ্বস্ত কর্মচারী হরিপন্থ ফাড়কে শহরের বাইরে পার্বতী মন্দিরে যান। এখন এখানে বসতি হয়েছে, সে সময় চারদিকে জঙ্গল। শুধু এখানে-ওখানে কিছু বাগান ছিল, পেশোয়ারা কখনও-কখনও বেড়াতে আসতেন। নারায়ণ রাও পার্বতীর মন্দিরে হরিপন্থ ফাড়কেকে ষড়যন্ত্রের কথা বললেন। হরিপন্থ বললেন তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবার কথা আছে, তারপর ফিরে কী করা উচিত দেখবেন। দুজনের কেউই তখন বুঝতে পারেননি যে, হাতে তাঁদের সময় নেই, দুজনের আর দেখা হবে না।

তখন বেলা আন্দাজ একটা। পেশোয়ার তখন দুপুরের খাওয়া হয়ে গিয়েছে। তিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন। এমন সময় নীচ থেকে শোরগোল শোনা গেল। একদল গর্দি পিছনের দরজা দিয়ে প্রাসাদে ঢুকে পড়েছে। তারা সংখ্যায় বেশ ভারী, পাঁচশোর মতো হবে। যে অল্প কয়েকজন প্রহরী ও দপ্তরের লোকজন তাদের বাধা দেবার চেষ্টা

করেছিল, গর্দিরা তৎক্ষণাৎ তাদের মেরে ফেলল। তারপর এগিয়ে যেতে গিয়ে দেখল সামনে একটা গোরু দাঁড়িয়ে। রাগের মাথায় তারা গোরুটিকেও কেটে ফেলল। গোহত্যা তখন ব্রাহ্মণ-হত্যার চেয়ে কম পাপের কাজ নয়। গর্দি ছাড়া আর কেউ হয়তো এ-কাজ করতে সাহস করত না। তারপর তারা দল বেঁধে তরোয়াল হাতে করে চেঁচাতে চেঁচাতে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল। অন্দরমহলে কয়েকজন ভৃত্য বাধা দিতে এসেছিল, তাদেরও প্রহরীদের দশা হল। দু-একজন দাসী গোলমাল শুনে ছুটে এসেছিল, তারাও পরিত্রাণ পেল না। নারায়ণ রাও তাঁর ঘর থেকে আঁচ পেয়েছিলেন গুরুতর কিছু ঘটছে। রঘুজি আংরের কথা হয়তো মনে পড়েছিল। তিনি নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে তাঁর কাকা রঘুনাথ রাওয়ের ঘরে আশ্রয় নিতে চেষ্টা করলেন। সে-ঘর খুব কাছে। দরজা বন্ধ ছিল। 'কাকা, আমাকে বাঁচাও!' বলে তিনি দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলেন। কেউ কেউ বলেন, রঘুনাথ রাও দরজা একটু ফাঁক করে বাইরে তাকিয়েছিলেন। কিন্তু ভাইপোর পিছনে একদল গর্দি তরোয়াল হাতে নিয়ে ছুটে আসছে দেখে দরজা ভাল করে খোলেননি। নারায়ণ রাও তাঁর দু' পা জড়িয়ে ধরেছিলেন। তিনি জোর করে পা ছাড়িয়ে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। গর্দিরা পেশোয়াকে ধরে কেটে ফেলল।

প্রাসাদে ও শহরে এত উত্তেজনা ও ভয় যে, বিকেল অবধি পেশোয়ার সৎকারের ব্যবস্থা করা গেল না। অবস্থা একটু ঠাণ্ডা হলে শান্তি ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা হতে লাগল। এরপর পেশোয়া কে হবেন? নারায়ণ রাওয়ের তো কোনো ছেলেপুলে নেই। থাকবার মধ্যে আছেন একমাত্র কাকা রঘুনাথ রাও, অনেক বছর ধরেই যিনি কিন্তু পেশোয়া হবার স্বপ্ন দেখছেন। কয়েকদিন পরে তাঁকে পেশোয়া বলে ঘোষণা করা হল। রঘুনাথ রাওয়ের বাসনা পূর্ণ হল। কিন্তু সে যে কত অল্পদিনের জন্য তখন তা তিনি বুঝতে পারেননি।

এদিকে পুনেতে গোলমালের ফলে অন্য রাজ্যগুলির মধ্যেও

উত্তেজনা দেখা দিতে লাগল। রঘুনাথ রাও পুনে থেকে সৈন্য নিয়ে কুচ করে হায়দরাবাদের নিজাম আলির সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এমন সময় বোঝা গেল, অনেক মারাঠা সর্দারেরই আর রঘুনাথ রাওয়ের সঙ্গে মিলে কাজ করবার ইচ্ছা নেই। পারলে যেন তাঁরা রঘুনাথ রাওকে এড়িয়ে চলেন। অল্পদিনের মধ্যেই কারণ বোঝা গেল। পুনের খবর, নারায়ণ রাওয়ের স্ত্রী গঙ্গাবাঈ সন্তানসম্ভবা। অনেকের ইচ্ছা হল, সন্তান হলে তাকেই পেশোয়া করা হবে। নানা ফাড়নবিস এই দলের নেতা। কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁরা নিজেদের একটা দল গড়ে তুললেন, আর নিজেদের নাম দিলেন 'বারোভাই'। তাঁদের উদ্দেশ্য নারায়ণ রাওয়ের ভাবী সন্তানের স্বার্থরক্ষা করা। তীরে এসে রঘুনাথ রাওয়ের নৌকো ডুবে যাবার উপক্রম। তিনি সাহায্যের জন্য হাত বাড়ালেন ইংরেজদের দিকে। এই থেকেই ইংরেজদের মারাঠা যুদ্ধের সূত্রপাত।

এ পর্যন্ত সবই একরকম হল। কিন্তু নারায়ণ রাওয়ের বিধবার যে পুত্রসন্তানই হবে, এ-কথা কে বলতে পারে ? কন্যা জন্মালে কী হত ? বারোভাই কি সেই মেয়ের পক্ষে দাঁড়াতেন ? যাই হোক, ইতিমধ্যে নারায়ণ রাওয়ের বিধবা স্ত্রীকে পুরন্দর দুর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পুরন্দর খুব সুরক্ষিত দুর্গ। এর দুটো কারণ থাকতে পারে। শন্‌বারওয়াড়ায় রঘুনাথ রাওয়ের স্ত্রী আনন্দীবাঈ স্বয়ং থাকতেন। তাঁর কাছে থাকা কি গঙ্গাবাঈ-এর পক্ষে নিরাপদ ? আর একপক্ষ (তাঁরা দলে ভারী ছিলেন না) ভাবতে লাগলেন, সত্যিই যদি একটি পুত্রসন্তান না হয়ে গঙ্গাবাঈয়ের একটি মেয়ে হয়, তবে কী হবে ? মেয়ের জায়গায় একটি সেই বয়সের ছেলেকে নিয়ে এসে গঙ্গাবাঈয়ের ছেলে বলে চালিয়ে দেওয়া কি অসম্ভব ? শেষ পর্যন্ত অবশ্য গঙ্গাবাঈয়ের একটি ছেলেই হল। রঘুনাথ রাওয়ের স্বপ্ন শেষ হয়ে গেল। রঘুনাথ কিংবা আনন্দীবাঈ, কেউই জোর করে বলেননি, ছেলেটি জাল।

অন্য একটি প্রশ্ন। দিনদুপুরে নারায়ণ রাও খুন হয়ে গেলেন, এ কি শুধু গর্দিদের কাজ। এর পিছনে কি আর কারুর হাত ছিল না? পুনের প্রধান বিচারপতি রামচন্দ্র শাস্ত্রী এ ব্যাপারে তদন্ত করেছিলেন। এ নিয়ে একটি মারাঠি গাথাও আছে। এই ঘটনাকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লেখেন। দেশের বেশির ভাগ লোক বিশ্বাস করত যে, নারায়ণ রাওকে খুন করবার পিছনে রঘুনাথ রাও ও আনন্দীবাঈয়ের হাত ছিল। এক টুকরো কাগজও পরে পাওয়া গিয়েছিল। তাতে লেখা ছিল, রঘুনাথ রাও হুকুম দিচ্ছেন যে 'ধরাবে'। অর্থাৎ এটা হচ্ছে পেশোয়া নারায়ণ রাওকে গ্রেপ্তার করার হুকুম। বাস্তবে কিন্তু দেখা গেল যে, কাগজটিতে কেউ একটি অক্ষর পরিবর্তন করেছে। মারাঠিতে 'ধ' অক্ষর ও 'ম' অক্ষর অনেকটা একই রকম দেখতে। সামান্য একটু পরিবর্তন করলে 'ধ'-কে সহজেই 'মা' বলে বোঝানো যায়। 'ধরাবে'র বদলে সেক্ষেত্রে পড়া হবে 'মারাবে'। অর্থাৎ 'হত্যা করো'।

ক্ষুব্ধ মহারাষ্ট্রীয়রা তখন অনেকবার প্রশ্ন করেছে, এই সাংঘাতিক কাজ কে করল? তাঁদের ভাষায়: 'ধ' চ 'ম' কওন্ কেলা? অর্থাৎ 'ধ'-কে 'ম' করল কে? এটা কি কাকিমা আনন্দীবাঈয়ের কাজ?

ছত্রপতির বংশধর

ছত্রপতি শিবাজি খুব বিচক্ষণ রাজা ছিলেন। কিন্তু তাঁর দুই ছেলে তাঁর এই গুণ পাননি। শিবাজি বেশিদিন বাঁচেননি। কোন্ সালে তাঁর জন্ম, তাও ঠিক করে বলা চলে না। ১৬২৭ হতে পারে, আবার কারও মতে ১৬৩০ সাল। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স প্রায় ষাট, কিংবা ষাটের একটু বেশি হয়েছিল। আওরঙ্গজেব আরও আঠারো বছর বেঁচে ছিলেন। শিবাজির বড় ছেলে শম্ভাজি সাহসী যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু তাঁর আর কোনো গুণ ছিল না। অনেকে বলত, তাঁর একজন বন্ধুর কুপরামর্শে তিনি অধঃপাতে যাচ্ছিলেন। বন্ধুটির উপাধি ছিল 'কবিকুলেশ' অর্থাৎ কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তখনকার লোকরা একটু বদল করে বলত 'কবিকলুষ', অর্থাৎ 'পাপের কবি'। ন'বছর রাজত্ব করার পর শম্ভাজি আওরঙ্গজেবের একজন সেনাপতির হাতে ধরা পড়লেন। আওরঙ্গজেব তখন দাক্ষিণাত্যে। তাঁকে এবং তাঁর বন্ধুকে আওরঙ্গজেবের কাছে ধরে নিয়ে যাওয়া হল, এবং সম্রাটের সামনে তাঁদের মেরে ফেলা হল। এরপর শিবাজির ছোট ছেলে রাজারাম রাজ্যশাসনের ভার নিলেন। রাজারাম ঠিক রাজা নন, রাজার প্রতিনিধি। শম্ভাজির ছেলে শাহু মোগল-শিবির থেকে যদি ফিরে আসেন, তিনিই রাজা হবেন।

আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য থেকে আর দিল্লি ফিরে যেতে পারেননি। আহ্‌মেদনগরের কাছে তাঁর মৃত্যু হয়। তখন ১৭০৭ সাল। ইতিমধ্যে মারাঠা অশ্বারোহীরা মোগল সাম্রাজ্যে ঢুকে খুব উৎপাত আরম্ভ করেছিল। মোগল সেনাপতি জুলফিকার খাঁ শাহুকে মুক্ত করে দিলে ফল খারাপ হবে না। মারাঠারা দুই দলে ভাগ হয়ে যাবে। নতুন সম্রাট আওরঙ্গজেবের বড় ছেলে মুয়াজ্জেম তখন প্রথম বাহাদুর শাহ নামে সিংহাসনে বসেছেন। মুক্তি পাবার সময় শাহু অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তিনি মোগলের বশম্বদ হয়ে থাকবেন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর মাস-তিনেক পরে তিনি নিজের রাজ্যে ফিরে এলেন। রাজারামেরও দিন শেষ হয়ে এসেছিল। জালনা দুর্গ থেকে মোগল সৈন্যের তাড়া খেয়ে পালিয়ে তিনি সিংহগড়ে এসে পৌঁছলেন। সেখানে মাসখানেক অসুস্থ থাকার পরে তাঁর মৃত্যু হয়।

জুলফিকার খাঁ যা ভেবেছিলেন তাই হল। রাজারামের বিধবা স্ত্রী তারাবাঈ রাজ্যের উপর দাবি ছাড়লেন না। শম্ভাজির দুষ্কৃতির ফলে সিংহাসনের উপর শাহুর দাবি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রথম পেশোয়া বালাজি বিশ্বনাথ শাহুর পক্ষে ছিলেন। প্রধানত তাঁর সাহায্যে শাহু ক্ষমতাশালী হয়ে উঠলেন। তারাবাঈ নিজের জায়গা রাখতে পারলেন না। তিনি সাতারার দুর্গে প্রায় বন্দিনীর মতো থাকতে লাগলেন। শাহুর ছেলে ছিল না। তিনি দত্তক নেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তারাবাঈ বলে পাঠালেন যে, তাঁর নিজের বংশেরই তো একজন আছে, সেই হবে সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। তারও নাম রাজারাম। তারাবাঈ বললেন, তাকে খুব অল্প বয়স থেকে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে। সে এতদিন এক গন্ধানি পরিবারে মানুষ হয়েছে। গন্ধানিদের পেশা হচ্ছে নাচ-গান করা। তরুণ রাজারামকে সাতারায় আনা হল। সাতারা দুর্গের নীচে তাঁর প্রাসাদ। তারাবাঈ তো স্বামীর নাম ধরে তাঁকে ডাকতে পারেন না, কাজেই তাঁর নাম একটু বদলে তাঁকে বলা হত রামরাজা। কিন্তু তাঁকে দিয়ে

তারাবাঈয়ের ইচ্ছাপূরণ হল না। পেশোয়ার সঙ্গে লড়াই করবার শক্তি বা ইচ্ছা কোনোটাই তাঁর ছিল না।

তারাবাঈ এতে ভীষণ রেগে গেলেন। রামরাজা ও তাঁর স্ত্রীকে চম্পাষষ্ঠী ব্রত উপলক্ষে দুর্গে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন তিনি। খাওয়া-দাওয়া ভালই হল, কিন্তু রামরাজা দুর্গ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে দেখলেন যে, তারাবাঈয়ের হুকুমে দুর্গের সব দরজা বন্ধ। বের হবার উপায় নেই। কেউ-কেউ বলেছেন, রামরাজার উচিত ছিল রক্ষীদের আক্রমণ করা। তারা নিশ্চয়ই শিবাজির বংশধরকে বাধা দিতে সাহস পেত না। দরজা খুলে দিত। এ-কথা হয়তো ঠিক। কিন্তু রামরাজা সে-ধরনের মানুষ ছিলেন না। তার বদলে তিনি তারাবাঈকে জিজ্ঞেস করতে গেলেন যে, তাঁর এ-রকম ব্যবহারের কারণ কী? তারাবাঈ দেখা করলেন না।

রামরাজার আর নিজের প্রাসাদে ফিরে যাওয়া হল না। তিনি সস্ত্রীক সাতারায় থাকতে লাগলেন। ধীরে-ধীরে এই পরিবেশের সঙ্গেই মানিয়ে নিতেও শিখলেন। তারাবাঈয়ের মৃত্যুর পরে রামরাজার অবস্থার উন্নতি হল, কিন্তু তাঁকে মুক্তি দেবার কথা কারও মনে হল না। সাতারায় বন্দী অবস্থায় থাকার সময় রামরাজা ও তাঁর বংশধররা শুনতেন যে, তাঁর সৈন্যরা সর্বত্র জয়ী হচ্ছে। তাঁর অশ্বারোহীরা পাঞ্জাব অতিক্রম করে গিয়েছে, মারাঠারাই উত্তর ভারতবর্ষের অধীশ্বর। পেশোয়া বছরে একবার এসে তাঁর কাছ থেকে রাজ্যশাসন ও যুদ্ধবিগ্রহের অনুমতি নিয়ে যেতেন। দুর্গের মধ্যে বসে শিবাজির বংশধর রাজ্যশাসনের খেলা খেলতেন।

রামরাজা ২৭-২৮ বছর এইরকম রাজা-রাজা খেলা খেললেন। তাঁর ছেলে ছিল না বলে তিনি দত্তক নিয়েছিলেন। নাম রেখেছিলেন দ্বিতীয় শাহু। তাঁর রাজত্বকাল ছিল ১৭৭৭ থেকে ১৮১০ পর্যন্ত, অর্থাৎ ইংরেজরা যখন দক্ষিণ ভারতে খুব প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ১৮১০ সাল পর্যন্ত তিনি বেঁচে ছিলেন। দ্বিতীয় মারাঠা

যুদ্ধে পেশোয়া তখন ইংরেজদের কাছে হেরে গিয়েছেন। ১৮০২ সালে বেসিনের সন্ধির ফলে পেশোয়ার ক্ষমতা অনেক কমে যায়। তাহলেও পেশোয়া প্রকৃতপক্ষে সাতারার রাজার প্রভু। সামান্য ব্যাপারেও রাজাকে পেশোয়ার কৃপার উপর নির্ভর করতে হত। তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ হয় পেশোয়ার মর্জির উপরে। দু-একটি উদাহরণ দিচ্ছি। রাজার কর্মচারীদের পেশোয়া নিয়োগ করতেন। তাঁদের উপর রাজার ক্ষমতা সবসময় খাটত না। এমনও হয়েছে যে রাজা তাঁদের অপরাধের জন্য শাস্তি দিলে পেশোয়া সে-শাস্তি মকুব করে দিয়েছেন। একবার রাজার ইচ্ছা হল দুজন নর্তকীকে মাইনে দিয়ে রাখবেন। প্রত্যেকের মাইনে মাসিক চল্লিশ টাকা। পেশোয়া সম্মতি দিয়েছিলেন। আর একবার রাজপ্রাসাদে জল আনবার ব্যবস্থা হচ্ছিল। খরচ বেশি পড়বে বলে পেশোয়া এই ব্যবস্থা নাকচ করে দেন।

১৮১০ সাল থেকে সাতারার রাজা হলেন প্রতাপসিং। ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও ১৮১৭ সালে পুনে থেকে পালিয়ে গেলেন। পালাবার সময় সাতারা দুর্গ থেকে রাজা প্রতাপসিং ও তাঁর পরিবারের কাউকে-কাউকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। তার কারণ স্পষ্ট। ইংরেজরা যদি এই সুযোগে প্রতাপসিংকে মারাঠাদের রাজা বলে ঘোষণা করেন, তাহলে পেশোয়া অসুবিধেয় পড়ে যাবেন। এইভাবে কয়েক মাস ধরে ইংরেজ সৈন্যের কাছে হঠে গিয়ে পালাতে পালাতে ১৮১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পেশোয়ার সর্বনাশ হয়ে গেল। অষ্ঠির যুদ্ধে তাঁর সেনাপতি বাপু গোকলা, যাঁর উপর তাঁর সব আশা-ভরসা ছিল, মারা গেলেন। প্রতাপসিংকে ফেলে বাজীরাও পালিয়ে গেলেন। তাঁর ফেলে-যাওয়া এক কোটি টাকাও ইংরেজদের হাতে এল। এলফিনস্টোনের কাছে সাতারার রাজাকে রেখে জেনারেল স্মিথ পেশোয়াকে আবার তাড়া করে বেড়াতে লাগলেন। প্রতাপসিংয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর

এলফিনস্টোন লিখলেন, প্রতাপসিংয়ের আচরণ স্বাধীন রাজার মতো। এলফিনস্টোনকে দেখে আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন না, নিচু হয়ে অভিবাদনও করলেন না। তাঁর ব্যবহার খুব ভদ্র, কথাবার্তা মার্জিত। তিনি দেখতে সুপুরুষ নন, বরং তাঁর ভাই তাঁর চাইতে দেখতে ভাল। তবে দুজনের চেহারার মিল আছে। তাঁদের মাকে দেখে এলফিনস্টোনের মনে হল, তিনি খুব বুদ্ধিমতী। একসময় সুরূপা ছিলেন বোঝা যায়। পেশোয়ার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে প্রতাপসিং খুব আনন্দিত হয়েছেন বোঝা গেল। এপ্রিলের ১০ তারিখে সাতারায় প্রতাপসিংয়ের অভিষেক হল।

প্রতাপসিংয়ের সঙ্গে প্রথম দিকে ইংরেজদের সদ্ভাব ছিল। এল্‌ফিনস্টোন তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন। বন্ধুর কাছে লেখা একটি চিঠিতে তিনি তাঁকে সবচেয়ে সভ্য মহারাষ্ট্রীয় বলে বর্ণনা করেছেন। ভেলভেটে মোড়া টেবিলের একদিকে বসে সাতারার রাজা নিজের হাতে চিঠি লিখছেন এবং অন্যান্য কাজ করছেন। এলফিনস্টোনের মনে হয়েছিল, এই দৃশ্য দেখলে শিবাজি কী ভাবতেন ! এলফিনস্টোন বলেছেন, প্রতাপসিং যে-ভাবে রাজ্যশাসন করছেন তা যে-কোনো ইউরোপীয়ের পক্ষেই গর্বের বিষয় হত। বিখ্যাত ঐতিহাসিক জেম্‌স কানিংহাম গ্রাণ্ট ডাফ প্রায় তিন বছর সাতারার রাজার অভিভাবকের কাজ করেছেন। তিনি এই কাজ থেকে অবসর নেবার পর এলেন ক্যাপ্টেন ব্রিগ্‌স। তিনিও পরে ঐতিহাসিক হয়েছিলেন। প্রতাপসিং মহাবলেশ্বরে যাবার জন্য একটি পথ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন এবং ইউরোপীয়দের জন্য সেখানে একটি গ্রীষ্মবাস। তার বদলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রতাপগড়ের বিখ্যাত শিবাজির ভবানী-মূর্তি রাজাকে ফেরত দিয়েছিলেন। তাঁর লেখাপড়ায় উৎসাহ ছিল, কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল।

কিন্তু কোম্পানির সঙ্গে সদ্ভাব স্থায়ী হল না। কেউ-কেউ বলতে লাগলেন, তিনি কোম্পানির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন। একবার খবর

এসেছিল, প্রতাপসিং ও বিঠুরের নির্বাসিত পেশোয়া বাজীরাও ইংরেজের হাত থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করছেন। তখন কিন্তু এই কথা কেউ বিশ্বাস করেননি। কিন্তু যে-কারণেই হোক, অবশেষে প্রতাপসিংয়ের রাজত্ব গেল। ১৮৩৯ সালে তাঁকে সরিয়ে দিয়ে তাঁর ভাই শাহজিকে রাজা করা হল।

প্রতাপসিংয়ের রাজ্য যখন কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, তখন তিনি প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছিলেন। কাগজপত্রসমেত ইংল্যাণ্ডে দূত পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। দূতদের একজন দরকারি কাগজপত্র আর অনেক টাকা নিয়ে অন্তর্ধান করেছিলেন। প্রতাপসিংয়ের সঙ্গে কোম্পানি ভাল ব্যবহার করেনি। যে ইংরেজ কর্মচারী তাঁকে কাশী নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি সমস্ত পথ তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছিলেন। প্রতাপসিং কিন্তু শেষ পর্যন্ত আশা ছাড়েননি। জর্জ টমসন নামে একজন ইংরেজ সাংবাদিককে বিলেতে পাঠিয়েছিলেন। তখনকার দিনে জর্জ টমসনকে অনেকে জানত। কিন্তু তাতে কিছু কাজ হল না। বারাণসীতে অবহেলার মধ্যে শিবাজির বংশধরের মৃত্যু হল। প্রতাপসিংয়ের ভাই শাহজির মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ সাতারা ইংরেজদের হাতে এসে যায়। শিবাজির রাজত্বের আর কোনো চিহ্ন রইল না।

গোলাম কাদিরের কাণ্ড

বাদশা আওরঙ্গজেব প্রথম আলমগির ১৭০৭ সালে দাক্ষিণাত্যে মারা গেলেন। আগেই বোঝা গিয়েছিল যে, তাঁর স্থান নিতে পারেন, তাঁর বংশধরদের মধ্যে এমন কেউ নেই। বাহান্ন বছর পরে আলি গহর, দ্বিতীয় শাহ আলম, অনেকদিন রাজত্ব করেছিলেন, প্রায় ৪৭ বছর। সাম্রাজ্য বলতে তখন আর বিশেষ কিছু ছিল না। প্রথম জীবনে তিনি দিল্লি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। এক সময় তিনি অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও মিরকাশিমের সঙ্গে মিলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। যুদ্ধে তাঁদের বড় রকমের হার হল। শাহ আলম তারপর বহুদিন পর্যন্ত এলাহাবাদে ইংরেজদের আশ্রয়ে থাকতেন। অবশেষে সাত-আট বছর পরে তিনি দিল্লি ফিরে গিয়ে মারাঠাদের আশ্রয়ে থাকেন। শাহ আলমের পিতৃপুরুষের সিংহাসনে বসবার আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এর পরিণাম তাঁর পক্ষে কত ভয়ঙ্কর হতে পারে সে-কথা বোঝা যায়নি। শাহ আলমের আয়ু দীর্ঘ ছিল, দীর্ঘ আয়ু না হলে তিনি হয়তো অত কষ্ট পেতেন না।

মোগল সাম্রাজ্য যখন ভেঙে টুকরো হয়ে যাচ্ছিল তখন আফগানরা রোহিলখণ্ডে তাঁদের নিজেদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁদের নেতা জবিতা খানের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে

গোলাম কাদির ক্ষমতায় এলেন। গোলাম কাদিরের ইচ্ছা ছিল তিনি সম্রাটের মির বকশি অর্থাৎ সেনাদলের অধিনায়ক হবেন, সব ক্ষমতা তাঁর হাতে আসবে। তিনি দিল্লির দিকে অগ্রসর হয়ে গেলেন এবং সম্রাট শাহ্ আলমের দর্শন চাইলেন। তখন পর্যন্ত দিল্লিতে মহাদজি সিন্ধিয়ার কিছু আধিপত্য ছিল, কিন্তু তিনি তখন খুব বিব্রত। গোলাম কাদিরকে বাধা দিতে পারেননি। তিনি বুঝেছিলেন গোলাম কাদির দিল্লিতে এলে মারাঠাদের আর ক্ষমতা থাকবে না। কিন্তু বাদশার নাজির মনজুর আলি গোলাম কাদিরকে নিয়ে আসবার জন্য খুব আগ্রহী ছিলেন। তখন পুরো বর্ষাকাল, যমুনার জল স্ফীত হয়েছে। অন্তত কিছুদিনের জন্য গোলাম কাদিরকে বাধা দেওয়া শক্ত হত না। সামান্য কয়েকজন মারাঠা সৈন্য যমুনার পূর্বতীরে শাহদরার কাছে গোলাম কাদিরকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাদের সে-চেষ্টা সফল হয়নি। গোলাম কাদির যমুনা পার হয়ে দিল্লি এলেন। শাহ্ আলমের নাজির মনজুর আলির সঙ্গে মারাঠাদের শত্রুতা ছিল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এইভাবে মারাঠাদের ক্ষমতা ধ্বংস করা যাবে। ১৭৮৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দু-হাজার রোহিলা সৈন্য নিয়ে গোলাম কাদির দিল্লি শহরে ঢুকলেন। বৃদ্ধ শাহ্ আলমের অন্য কোনো উপায় ছিল না। তিনি গোলাম কাদিরকে খুব উঁচু পদ দিলেন। সম্রাট নিজে অবশ্য পছন্দ করেননি। তিনি ভেবেছিলেন রোহিলারা এতে খুশি হয়ে দিল্লি ছেড়ে চলে যেতে পারে।

শাহ্ আলম যা আশা করেছিলেন তা হয়নি। গোলাম কাদির ভেবেছিলেন যে, তিনি বিনা ঝঞ্ঝাটে সম্রাটের সব ক্ষমতা নিয়ে নেবেন, তাও হয়নি। বেগম সমরু তাঁর গোলন্দাজ সৈন্য নিয়ে সম্রাটকে রক্ষা করবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। গোলাম কাদির তখনকার মতো যমুনা পার হয়ে ফিরে গেলেন। বেগম সমরুর বাধা তিনি অতিক্রম করতে পারেননি। এই শান্তি খুব অল্পদিনের। গোলাম কাদির শক্তি সংগ্রহ করে যমুনার পূর্ব দিক থেকে দিল্লির কেল্লার দিকে

কামান দাগতে আরম্ভ করলেন। বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য শাহ আলম সিন্ধিয়ার কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন। সিন্ধিয়ার তখন নিজেরই অবস্থা ভাল নয়, কোনো ফল হল না।

দিল্লিতে শাহ আলমের শত্রুর অভাব ছিল না। দিল্লিতে মহম্মদ শাহর বেগম মালিকা-ই-জামানি শাহ আলমের পুরনো শত্রু। তিনি গোলাম কাদিরকে বারো লক্ষ টাকা দিয়ে সাহায্য করতে চাইলেন। শর্ত হল শাহ আলমের শাসনের অবসান ঘটাতে হবে। গোলাম কাদিরের যে বন্ধুত্বের মুখোশ এতদিন ছিল সেটা এইবার খসে পড়ল। তিনি খোলাখুলি দিল্লির প্রজাদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করলেন। এর আগেও দিল্লি অনেকবার লুঠ করা হয়েছে। গোলাম কাদিরের ধারণা হল যে, সম্রাটের কাছ থেকে তিনি যত টাকা আদায় করতে পারবেন ভেবেছিলেন, তা হচ্ছে না। ১৭৮৮ সালের আগস্ট মাসের প্রথমে দিল্লি শহর গোলাম কাদিরের হাতে চলে এল। শাহ আলমের বাদশাহি তখনকার মতো শেষ। আহমেদ শাহর পুত্র কেদার বখতের পুত্রকে সম্রাট বলে ঘোষণা করা হল। শাহ আলম এবং তাঁর ছেলেরা বন্দী হলেন। ততক্ষণে দিল্লি শহরে রোহিলা সৈন্যদের লুঠপাট আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। গোলাম কাদিরের অর্থলোভের সীমা ছিল না। তাঁর তাগাদায় উত্ত্যক্ত হয়ে শাহ আলম বারবার বলতে লাগলেন যে, তাঁর যা কিছু সম্পদ ছিল সে সবই তিনি দিয়েছেন। "টাকা কি আমি পেটের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি ?" এই কথায় গোলাম কাদিরের রাগ আরও বেড়ে গেল। গোলাম কাদির বললেন, "দরকার হলে তোমার পেট চিরে দেখব সত্যি টাকা লুকনো আছে কি না।" তারপর গোলাম কাদিরের হুকুমে শাহ আলমের চোখ অন্ধ করে দেওয়া হল। তখনও শেষ হয়নি। গোলাম কাদিরের আদেশে একজন চিত্রকর এসে একটি ছবি আঁকল। শাহ আলম চিত হয়ে শুয়ে আছেন, তাঁর বুকের উপর বসে গোলাম কাদির ছুরি দিয়ে তাঁর চোখ খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে বার করে নিচ্ছে।

কয়েকদিন শাহ্ আলমকে ঐ অবস্থায় রেখে দেওয়া হল, একফোঁটা জলও তিনি পেলেন না। বাদশাহের অন্দরমহল লুঠ করা হল। এর আগেও দিল্লিতে লুটপাট হয়েছে। কিন্তু তখনও অন্দরমহল লুট করার জন্য কেউ হাত বাড়ায়নি। অত্যাচারের যে-সব গল্প লোকের মুখে শোনা যাচ্ছিল, তাই শুনে একজন বেগম ভয়েই মারা গেলেন। হারেমে বেগমদের উপর অত্যাচারের সীমা ছিল না। সব শেষ হলে নাজির মনজুর আলির পালা। গোলাম কাদির তাকে বললেন, "কেল্লার দাসদাসীরাও জানে কোথায় ধনসম্পত্তি লুকনো আছে, তোমার তো আরও বেশি জানা উচিত।" গোলাম কাদিরের লোকেরা মনজুর আলিকে আচ্ছা করে প্রহার করল, তার বাড়ি লুট করা হল। মনজুর আলির বাড়িতে পাওয়া গেল চল্লিশ হাজার টাকা, পাঁচ হাজার মোহর, তাছাড়া সোনা-রুপোর বাসনপত্র। গোলাম কাদিরের মনে হল এগুলো তেমন বেশি কিছু নয়। আরও অনেক পাওয়া যেতে পারত।

গোলাম কাদিরেরও দিন ঘনিয়ে এসেছিল। মহাদজি সিন্ধিয়া অবশেষে তাঁর সেনাপতি রানা খানের অধীনে বড় একদল সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন দিল্লি অধিকার করতে। সেপ্টেম্বর মাসের শেষে মারাঠা সৈন্যরা দিল্লি এসে পৌঁছল। গোলাম কাদির ভাবলেন, এইবার দিল্লি ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত। তিনি পালিয়ে গেলেন। মারাঠারা আবার দিল্লির কর্তা হল।

সম্রাটের পরিবারের তখন এমন অবস্থা যে, অনেকদিন কারও খাওয়া হয়নি। মারাঠারা তাদের রান্নাকরা খাবার পাঠাতে লাগল। ইতিমধ্যে গোলাম কাদিরের সর্বনাশ আরম্ভ হয়েছে। যে-সব সম্পদ দিল্লি লুট করে তিনি জমা করেছিলেন, তার একটা বড় অংশ রাস্তায় লুট হয়ে গিয়েছে। মারাঠা সৈন্যদের হাতে পড়ে গোলাম কাদিরের সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আক্রমণের সময় গোলাম কাদির লুকিয়ে ছিলেন। অবশেষে ঘোড়ার একটি পা জখম হয়ে গেল। সেই ঘোড়া

ছেড়ে দিয়ে গোলাম কাদির পায়ে হেঁটে পালাতে লাগলেন। এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে তিনি ভাবলেন নিরাপদ আশ্রয় পাওয়া যাবে। গোলাম কাদিরকে দেখে ব্রাহ্মণের সন্দেহ হয়েছিল। কাছেই একজন মারাঠি সেনাপতির শিবির পড়েছিল। তাঁকে খবর পাঠানো হল। কয়েকজন সৈন্য এসে গোলাম কাদিরকে বন্দী করে নিয়ে গেল। প্রথমে তাঁকে মথুরায় নিয়ে যাওয়া হল। সেখান থেকে দিল্লির পথে তাঁকে পিটিয়ে মারা হল। গোলাম কাদিরের চোখ খুবলে নেওয়া হয়েছিল, ঠিক যেমন শাহ আলমকে করা হয়েছিল। কথা ছিল তাঁর মৃতদেহ দিল্লি নিয়ে যাওয়া হবে। সম্ভব হল না।

সেই সময়কার একজন লেখক বলেছেন, পথে তাঁর মৃতদেহ গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। একটি কালো কুকুর, দেখতে অদ্ভুত, তার দু'চোখের চারদিকে সাদা দাগ। কুকুরটি দু'দিন সেই মৃতদেহকে পাহারা দিল। গোলাম কাদিরের মৃতদেহ থেকে যে রক্ত পড়ত, কুকুরটা তা চেটে খেত। দু'দিন পরে দেখা গেল গোলাম কাদিরের মৃতদেহ অদৃশ্য হয়েছে, কুকুরটিও নেই। কেউ কেউ বিশ্বাস করত, কুকুরটি আসলে নরক থেকে এসেছিল গোলাম কাদিরকে যথাস্থানে নিয়ে যেতে।

এই গল্পে একটু ফাঁক আছে। দু'দিন ধরে মৃতদেহ থেকে কি রক্ত পড়তে পারে ? সে-কথা অবশ্য এখন তুলে লাভ নেই।

ঘোড়েপর্ হাওদা

কাশীতে দশাশ্বমেধ ঘাট সবার জানা। গঙ্গার দিকে মুখ করে দাঁড়ালে ডানদিকে বাঙালিটোলার সরু গলি। গলির মুখ থেকে অল্প হাঁটলেই চৈত সিংয়ের প্রাসাদ। বাড়ির পিছন দিক থেকেও আসা যায়। তখন নৌকা ভরসা। ইংরাজ সৈন্যরা আক্রমণ করলে রাজা চৈত সিং নৌকা করে পালিয়েছিলেন। কী করে তাঁর এরকম বিপদ হল সেই কথা বলছি।

চৈত সিংয়ের ঠাকুর্দার নাম ছিল মনসারাম। ইনি অনেক টাকা জমিয়েছিলেন ও জমি-জমাও করেছিলেন। তিনি ছিলেন জমিদার, তাঁর ছেলে বলবন্ত সিংকে সবাই রাজা বলত। তাঁর জমিদারি তাঁর বাবার চেয়ে অনেক বড় ছিল। তিনি অযোধ্যা নবাবের অধীন ছিলেন। ১৭৭৫ সালে প্রভু বদল হল। সন্ধির ফলে চৈত সিংয়ের জমিদারি ইংরাজদের অধীনে চলে এল। ঠিক হল চৈত সিং এখন থেকে কর জমা দেবেন পাটনায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির খাতাঞ্চি-খানায়। করের পরিমাণ ২২,৫০,০০০ টাকার কাছাকাছি। ঠিক হল চৈত সিংয়ের জমিদারিতে কোম্পানি কোনোরকম হস্তক্ষেপ করবেন না। কোম্পানির পক্ষ থেকে আরও বলা হল চৈত সিং দু-হাজার অশ্বারোহী রাখবেন। সেটা তাঁর ইচ্ছা হলে তবে। তিনি

রাখতে বাধ্য নন। চৈত সিং অশ্বারোহী রাখবেন বলে কোনো অঙ্গীকারও করেননি। কোম্পানির যদি এই অশ্বারোহীর সাহায্যের দরকার হয় তাহলে তার জন্য চৈত সিংকে খরচপত্রের টাকা দেওয়া হবে। এই অশ্বারোহীর দল রাখা না রাখা চৈত সিং-এর মর্জির উপর নির্ভর করবে। এজন্য ইংরাজরা কোনোরকম জোর করবেন না।

১৭৭২ সালে হেস্টিংস গভর্নর-জেনারেল হলেন। তখন কোম্পানির টাকা-পয়সার টানাটানি। মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে অনেক টাকা খরচ হল। ১৭৭৮ সালের মাঝামাঝি কলকাতায় খবর এসে পৌঁছল যে, ইউরোপে ফরাসিদের সঙ্গে ইংরাজদের যুদ্ধ বেধেছে। যুদ্ধ হলেই টাকার খুব দরকার হয়। চৈত সিংকে বলা হল যে যুদ্ধের খরচ মেটাবার জন্য তাঁর কিছু করা উচিত। সেইজন্য তাঁকে তিন ব্যাটেলিয়ান সৈন্যের খরচ দিতে হবে। এক ব্যাটেলিয়ানে হাজার লোকের কিছু কম থাকে। কয়েকটি ব্যাটেলিয়ান একসঙ্গে করে ব্রিগেড তৈরি হয়। ব্রিগেডে হাজার-দশেক সৈন্য থাকে। চৈত সিং দেখলেন তাঁর উপর অনেক টাকার দায়িত্ব এল। তিনি ইংরাজদের বললেন : এত খরচ করা তাঁর সাধ্যের বাইরে। আরও টাকা দেবার কথা হয়েছিল। চৈত সিং-এর দূত জানালেন : অসম্ভব। শেষে ইংরাজের ধমক খেয়ে দূত স্বীকার করলেন, তাঁর মনিব পাঁচ লাখ টাকা দিতে রাজি আছেন। কিন্তু এই অঙ্গীকার শুধু এক বছরের জন্য। হেস্টিংস বললেন, তা হবে না। যতদিন ফরাসিদের সঙ্গে যুদ্ধ চলবে ততদিন বছরে পাঁচ লাখ টাকা চাই।

হেস্টিংসের ধারণা হল যে, চৈত সিং গোলমাল করবার চেষ্টায় আছেন। কোম্পানির সৈন্যদের চৈত সিংয়ের রাজ্যের মধ্যে ঢুকবার হুকুম দেওয়া হল। এতে কোম্পানির যে বাড়তি খরচ হবে, হেস্টিংস জানালেন—তাও চৈত সিংকে দিতে হবে।

বছর-দুয়েক এরকম ভাবে চলল। চৈত সিং তারপর হেস্টিংসকে জানালেন যে, তিনি তাঁর সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন তার জন্য তিনি

অনুতপ্ত। সেই সঙ্গে হেস্টিংসকে দু-লাখ টাকা পাঠালেন। এটা ঘুষ। তখনকার দিনে বড়-বড় সাহেবদের এরকম ঘুষ দেওয়া অজানা ছিল না। হেস্টিংস একটু ইতস্তত করে টাকাটা নিলেন। কিন্তু এই টাকা নিজের তহবিলে জমা করলেন না। মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধে খরচ করবার জন্যে তুলে রাখলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে চৈত সিংয়ের কাছে জানতে চাইলেন—আরও টাকা তাঁর দেবার কথা ছিল তার কী হল ? দু-হাজার অশ্বারোহী রাখবার কথা ছিল, তার কী ব্যবস্থা হয়েছে ? আগেই বলেছি, দু-হাজার অশ্বারোহী যে রাখতেই হবে এমন কথা হয়নি।

ইংরাজরা দু-হাজার অশ্বারোহী থেকে আস্তে-আস্তে দেড় হাজারে নামলেন, তারপর এক হাজারে। চৈত সিং বললেন, এক হাজার অশ্বারোহীর মাইনে দেবার মতো টাকাও তাঁর নেই। তার বদলে তিনি পাঁচশো অশ্বারোহীর একটি দল তৈরি করলেন আর পাঁচশো পদাতিক যোগাড় করলেন। তারপর হেস্টিংসকে খবর দিলেন। হেস্টিংস চৈত সিংয়ের এই চিঠির উত্তর দেওয়ার দরকার আছে বলে মনে করলেন না—বরং ভাবলেন যে, চৈত সিংকে উচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার। গভর্নর-জেনারেলের কথা না শুনবার ফল কী হতে পারে তাঁকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

১৭৮১ সালের জুলাই মাসে ওয়ারেন হেস্টিংস বক্সারে এসে পৌঁছলেন। বক্সার চৈত সিংয়ের জমিদারির পূর্ব-সীমান্ত। অলিখিত নিয়ম হচ্ছে যে, সীমান্তে এরকম গণ্যমান্য অতিথি এলে সেই জায়গায় গিয়ে অতিথির অভ্যর্থনা করতে হয়। চৈত সিং বক্সারে এলেন। সঙ্গে একটি বড় নৌবাহিনী এল, তার নাবিক ও সৈন্যদের সংখ্যা দু-হাজার হবে। এত লোকজন নিয়ে গভর্নরের সঙ্গে দেখা করতে আসা উচিত হয়নি। হেস্টিংসের মেজাজ আরও খারাপ হল। চৈত সিং এইবার ভয় পেলেন। তিনি তাঁর পাগড়ি মাথা থেকে খুলে হেস্টিংসের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। পাগড়ি পাঠিয়ে দেওয়ার অর্থ

বশ্যতা স্বীকার করা। হেস্টিংসের তখন এত রাগ হয়েছিল যে, তিনি সেই পাগড়ি গ্রহণ করলেন না। সোজা বারাণসী রওনা হয়ে গেলেন। সেখানেও হেস্টিংস চৈত সিংকে তাঁরসামনেআসতে দিলেন না—তাঁর কাছে কোম্পানির কী-কী দাবি লিখে জানালেন। চিঠিতে এমন কথাও ছিল যে চৈত সিংরাজ্যশাসন করবার অনুপযুক্ত। রাজ্যে চুরি-ডাকাতি লেগেই আছে।

চৈত সিং খুব বিনীত উত্তর দিলেন। বললেন, তাঁর শত্রুরা তাঁর যাতে সর্বনাশ হয় এমন কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছে। চিঠির শেষে ছিল—'আমি আপনার দাস... আপনার দিন-দিন শ্রীবৃদ্ধি হোক।'

এই চিঠি পেয়েও হেস্টিংসের রাগ কমল না। পরে তিনি তাঁর কাউন্সিলের সদস্যদের বলেছিলেন : চিঠির ভাষা দেখলেন আপনারা ? এ তো নিজের সাফাই নয়, আমার বিরুদ্ধে কথা। কাশীর রেসিডেন্ট উইলিয়াম মার্কাম্‌কে হুকুম দিলেন, তিনি যেন পরদিন ভোরে সৈন্য নিয়ে চৈত সিংকে গ্রেপ্তার করেন। চৈত সিং যদি কোনোরকম বাধা দিতে চান তাহলে যেন মেজর পপামের সৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়।

রাজাকে গ্রেফতার করা হলে পরবর্তী হুকুম না আসা পর্যন্ত মার্কাম যেন তাঁকে নিজের কাছে বন্দী করে রেখে দেন। চৈত সিং কোনো বাধা দেননি। বন্দী হবার পর হেস্টিংসকে একটি চিঠি লিখলেন। তার একটি অংশ এইরকম : আমি তো পূর্বেই আপনার নৌকায় উঠে বলেছিলাম যে, আমি কোম্পানির সেবক। মন-প্রাণ দিয়ে কোম্পানির সেবা করব। আমাকে যা করতে ইচ্ছা হয় আপনি নিজের হাতে করুন। আমি আপনার দাস। সান্ত্রীর কি কোনো দরকার আছে ? রেসিডেন্ট মার্কামও ওয়ারেন হেস্টিংসকে সেই কথাই লিখেছিলন। চৈত সিং গ্রেফতার হওয়ার সময় কোনো বাধা দেননি। তিনি বলেছিলেন, তাঁর একটি মাত্র প্রার্থনা—তাঁর যেন গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা থাকে। তাঁর জমিদারি তাঁর দুর্গ, তাঁর ধনরত্ন এমনকি তাঁর

নিজের জীবনও তিনি হেস্টিংসের পায়ে রাখছেন। হেস্টিংস এইবার চৈত সিংকে লিখলেন : ভয়ের কোনো কারণ নেই। মার্কামসাহেব তাঁর সঙ্গে দেখা করে সব কথা জানাবেন।

চৈত সিং লিখলেন : আপনি আমার রক্ষাকর্তা, আপনি তো আমাকে আপনার স্নেহের ছায়ায় আবৃত করে রেখেছেন। আমি এখন সব দুশ্চিন্তা ও ভয় থেকে মুক্ত। আপনিই আমার প্রভু। আপনি যা বলবেন আমি তাই ঠিক মনে করব।

হেস্টিংস যা চেয়েছিলেন এ-পর্যন্ত তাই হচ্ছিল। রাজাকে বন্দী করার খবর পেয়ে কিন্তু ঘটনা এইবার অন্য দিকে মোড় নিল। রামনগর থেকে দলেদলে সশস্ত্র লোক নদী পার হয়ে চৈত সিংয়ের প্রাসাদের দিকে আসতে লাগল। চৈত সিংয়ের প্রাসাদে যে-সব ইংরাজ সৈন্য মোতায়েন ছিল তারা হঠাৎ আবিষ্কার করল যে, তাদের সঙ্গে বন্দুক আছে কিন্তু ভুল করে গুলি আনা হয়নি। মেজর পপাম্ বিপদ বুঝতে পেরে বাইরে থেকে অন্য সৈন্যদের খবর দিয়ে ডেকে পাঠালেন। তারা যখন এসে পড়ল তখন প্রাসাদের চারপাশে চৈত সিংয়ের এত প্রজাদের ভিড় যে, ভিতরে প্রবেশ করা অসম্ভব। সরু গলির ভিতরে ইংরাজ সৈন্যরা সুবিধা করতে পারল না। চৈত সিংয়ের লোকরা শেষপর্যন্ত ইংরাজ সৈন্যদের উপর গুলি ছুঁড়তে লাগল। চৈত সিং বুঝতে পারলেন যে, ঘটনা যে দিকে যাচ্ছে তাতে তাঁর সর্বনাশ হবে। তিনি একটি ছোট দরজা দিয়ে নদীর দিকে এগিয়ে গেলেন। জল সেখান থেকে অনেক নীচে। তিনি নিজের পাগড়ি বারান্দার সঙ্গে বেঁধে তাই ধরে নীচে নেমে গেলেন। সেখানে আগে থেকেই নৌকো রাখা ছিল। সেই নৌকোয় করে তিনি ওপারে রামনগরে পৌঁছে গেলেন।

চৈত সিংয়ের লোকরা যখন প্রাসাদে ইংরাজ সৈন্যদের আক্রমণ করল তখন তাদের কিছু করার সাধ্য ছিল না। অল্প সময়ের মধ্যে তাদের আর কেউ বাকি রইল না। তিনদিন পরে ওয়ারেন হেস্টিংস

এক বড় সৈন্যদল রামনগরে পাঠিয়েছিলেন। রামনগরেও ইংরাজদের সুবিধা হল না। সেখানেও সঙ্কীর্ণ পথ, গলির মধ্যে ইংরাজদের বিপদ হতে লাগল। দুদিকে যদি বড় বাড়ি থাকে তাহলে সেখান থেকে আক্রমণ এলে তাকে প্রতিরোধ করা কঠিন। একজন ইংরাজ কর্মচারী তাঁর সৈন্য নিয়ে বিবেচনা না করে একটি গলির মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন, সেখান থেকে আর বেরিয়ে আসতে পারেননি। ইংরাজ সৈন্যদের এই দ্বিতীয়বার বিপত্তি ঘটল। গুজব রটল যে, এইবার ওয়ারেন হেস্টিংসকেও আক্রমণ করা হবে। সমস্ত এলাকা জুড়ে ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চেষ্টা হচ্ছে। হেস্টিংস জায়গা নিরাপদ না দেখে চুনারে পালিয়ে গেলেন। এই ঘটনাকে নিয়ে একটি ছড়া তৈরি হয়েছিল—

ঘোড়েপর হাওদা, হাথি পর জিন,
জল্‌দি ভাগ গয়া ওয়ারেন হেস্টিন্।

হাওদা তো হাতির পিঠে লাগানো হয় কিন্তু ভুল করে তা ঘোড়ার পিঠে লাগাবার চেষ্টা হয়েছিল। এমন গোলমালে বিদ্রোহ খুব তাড়াতাড়ি বারাণসী থেকে ফৈজাবাদ ও তার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু তা বেশিদিন স্থায়ী হল না। জোয়ারের ঢেউয়ের মতো যা কোম্পানির শাসনকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল তা আবার ভাটার জলের মতো তাড়াতাড়ি সরেও গেল। উত্তেজনা কমে আসবার পরে হেস্টিংস নতুন ব্যবস্থা নিলেন।

চৈত সিংয়ের পরিবারের একজন, মোহিপনারায়ণকে চৈত সিংয়ের জায়গায় বসানো হল। তাঁর হাতে বেশি ক্ষমতা রইল না। তাঁর বাবা দিগ্বিজয় সিংকে নায়েব করে দেওয়া হল, তাঁর হাতেই ছিল প্রকৃত ক্ষমতা। তাও আবার অনেক ছেঁটে দেওয়া হল। দিগ্বিজয় সিংয়ের বিচার-ব্যবস্থা বা টাঁকশালের উপর কোনো কর্তৃত্ব রইল না। খাজনার

হার ওয়ারেন হেস্টিংস প্রায় দ্বিগুণ করে দিলেন। এখন থেকে বছরে চল্লিশ লাখ টাকা।

চৈত সিং ইতিহাস থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত এই নিয়ে অনেক আলোচনা চলেছিল। হেস্টিংসের সমালোচকরা প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, হেস্টিংসের এই কাজ কি উচিত হয়েছিল ? চৈত সিং তো সাধারণ জমিদার ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন রাজা। তাঁর সঙ্গে এরকম ব্যবহার কি উচিত হয়েছিল ? হেস্টিংসের কি চৈত সিংয়ের উপর কোনো রাগ ছিল ? এই উপলক্ষে তিনি কি শোধ তুলতে চেয়েছিলেন ? অন্যদিকে হেস্টিংসের বন্ধুরা বলেছেন যে, হেস্টিংস কোথাও নিয়মের বাইরে কাজ করেননি। ফরাসিদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় তিনি যে বাড়তি সাহায্য চেয়েছিলেন তাতে তাঁর অধিকার ছিল। তাছাড়া চৈত সিংয়ের শাসনও খারাপ ছিল। দেশে চুরি-ডাকাতির অন্ত ছিল না। হেস্টিংস যা করেছেন তার ফল ভালই হয়েছে।

শেষ কথা বলা কঠিন। ইংরাজরা বারেবারে বলেছিলেন যে, সমস্ত দেশ জুড়ে কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চেষ্টা চলেছিল। সত্যিই কি তাই হয়েছিল ? হয়ে থাকলেও তাতে চৈত সিংয়ের কতটা হাত ছিল ! এসব কথার কিন্তু উত্তর দেওয়া এখন আর সম্ভব নয়।

হার্সিসাহেবের কাণ্ড

হার্সি (Hersey) পরিবারের নাম সাধারণত ইতিহাসের বইয়ে পাওয়া যাবে না। তাঁরা খাঁটি ইংরেজ ছিলেন না। তাঁরা এদেশের বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিলেন, বিয়েও করতেন ভারতীয় মেয়েদের। হার্সির প্রথম নাম হায়দার। তাঁর মা জাঠ পরিবারের মেয়ে। লর্ড ওয়েলেসলির আগে পর্যন্ত তাঁরা ভারতীয় নবাব কিংবা রাজাদের কাছে চাকরি করেছেন। প্রত্যেকের কিছু কিছু সৈন্য থাকত। ভাল সৈনিক বলে ইউরেশিয়ানদের খ্যাতি ছিল। তাঁরা ভাল গোলন্দাজ হতেন। কেউ ছোটখাটো রাজ্যও গড়ে নিয়েছিলেন। লর্ড ওয়েলেসলির সময় থেকে এইসব অর্ধ-বিদেশীদের সুখের দিন শেষ হল। তিনি হুকুম দিলেন বিদেশীদের এভাবে চাকরি দেওয়া বন্ধ করতে হবে। অন্যান্যদের মতো হার্সি-পরিবারেরও কিছু অসুবিধা হল। তবে মেজর হার্সি অন্যদের থেকে একটু আলাদা ধরনের ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ভারতীয় রাজা কিংবা নবাবদের কাছে চাকরি করেছেন। তাঁর পরিবারের অনেকে ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধের পর থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাদলেও কাজ করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে মেজর হার্সি অযোধ্যার নবাবের অধীনে চাকরি নিয়েছিলেন। একসময় তিনি দৌলতরাও

সিন্ধিয়ার সৈন্যদলে ফরাসি অধিনায়ক পেরনের অধীনেও চাকরি করেছেন। পরে তিনি দল ছেড়ে জর্জ টমাসের কাছে চাকরি নিয়েছিলেন। জর্জ টমাস আয়ারল্যান্ডের লোক। তিনি পেরনের শত্রু ছিলেন। হার্সির ইচ্ছা হল, তিনি রাজপুতানায় কোথাও তাঁর নিজের একটি ছোট্ট রাজ্য গড়ে তুলবেন। কিন্তু ওয়েলেসলির সময় থেকে এ আর সম্ভব থাকল না। বেশির ভাগ সৈন্যদের ছাড়িয়ে দিতে হল এবং অল্প লোক নিয়ে তিনি কোম্পানির সৈন্যদলে যোগ দিলেন। কোম্পানির কাছ থেকে মাসিক আটশো টাকা পেতেন।

মারাঠাযুদ্ধ শেষ হবার পর হার্সি একজন মুসলমান মহিলাকে বিয়ে করে রোহিলখণ্ডে একটি গ্রামে গিয়ে বসতি করলেন। কিন্তু চুপচাপ বসে থাকা হার্সির স্বভাবে ছিল না। তিনি একদল পরিব্রাজকের সঙ্গে উত্তর-ভারতবর্ষে গঙ্গা-যমুনার উৎপত্তির জায়গা জরিপ করতে বেরিয়েছিলেন।

এর চার বছর পরে তিনি একটি খুব বড় কাজে হাত দিয়েছিলেন। উইলিয়াম মুরক্রফট নামে একজন পণ্ডিত পরিব্রাজকের সঙ্গে যোগ দিয়ে হার্সি মানস-সরোবরে গিয়েছিলেন। তাঁর দুটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মানস-সরোবর জরিপ করা, আর সে-দেশ থেকে ভেড়ার লোমের নমুনা সংগ্রহ করে দেশে নিয়ে আসা। ১৮১২ সালে গরমের সময় যোশীমঠ থেকে যাত্রা করলেন। তিব্বত তখন অন্য দেশের লোকের কাছে নিষিদ্ধ দেশ। বাইরের লোক ধরা পড়লে তাঁর প্রাণসংশয় হতে পারত। মুরক্রফট ও হার্সি দুজনেই ছদ্মবেশে সন্ন্যাসীর পোশাক পরে গিয়েছিলেন। এঁরা নিশ্চয়ই হিন্দি বলতে পারতেন। মুরক্রফটের শরীর ভাল যাচ্ছিল না বলে তিনদিনের বেশি মানস-সরোবরে থাকা সম্ভব হয়নি। মুরক্রফটের লেখা একটি রোজনামচা আছে, তাতে ক্যাপ্টেন হার্সির নাম বহুবার করা হয়েছে। কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির এক সভায় এই রোজনামচা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। আরও বছর-দুয়েক পরে যখন নেপালের সঙ্গে

ইস্ট ইন্টিয়া কোম্পানির যুদ্ধ বাধল তখন হার্সি সে-যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। এর অল্প পরে রোহিলখণ্ডে এক বিদ্রোহের সময় আবার তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হয়ে লড়াই করেছিলেন।

১৮২৪ সালে ইংরেজরা যখন ভরতপুরে দুর্গ অবরোধ করেন হার্সিও তখন তাঁদের সঙ্গে সে-যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। রোহিলখণ্ডের বিদ্রোহের আগেই কাজের জন্য হার্সির পদোন্নতি হয়েছিল। তিনি 'মেজর' হলেন।

হার্সি যে অনেক বিষয়ে সাধারণ লোকের চেয়ে অন্য ধরনের ছিলেন সেকথা তাঁর কাজ থেকে স্পষ্ট হবে। তাঁকে নির্বোধ মনে করবারও কোনো কারণ নেই। কিন্তু ১৮৩২ সালে তিনি এমন একটি কাণ্ড করে বসলেন যে, সরকারি মহলে তাঁর নাম পুনর্বার শোনা যেতে লাগল।

কানপুরের কাছে বিঠুরে ভূতপূর্ব পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও থাকতেন। মারাঠাযুদ্ধের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এক জায়গায় তাঁর বাসস্থান ঠিক করে দিয়েছিলেন। কোম্পানির কাছ থেকে তিনি বছরে আট লক্ষ টাকা বৃত্তি পেতেন। সেকালে অনেক টাকা। এই টাকায় তাঁর ভালভাবে দিন কেটে যেত। ইচ্ছামতো দানধ্যান করতেন। ইংরেজরাও বোধহয় চেয়েছিলেন, বাজীরাও বন্দিদশায় এ-সব করে সুখে থাকুন। যুদ্ধবিগ্রহে তাঁর নিজের কোনো উৎসাহ ছিল না। বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাবার জন্য যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন তা-ও নয়। তাঁর দেওয়ান রামচন্দ্র পন্ত পুনা থেকে মনিবের সঙ্গে বিঠুরেএসেছিলেন। পেশোয়ার সঙ্গে কয়েক হাজার লোকও মহারাষ্ট্র দেশ থেকে এসেছিলেন। এই নিয়ে বাজীরাওয়ের পৃথিবী। তাঁর স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল থাকত না। যখন তাঁকে এত টাকা বৃত্তি দেওয়া হল তখন ইংরেজরাও কেউ কেউ ভেবেছিলেন শেষ পর্যন্ত কোম্পানির বেশি টাকা খরচ হবে না। বাজীরাওয়ের যা শরীর তিনি হয়তো দীর্ঘকাল বাঁচবেন না। কিন্তু তাঁদের আশার মুখে ছাই দিয়ে

বাজীরাও ত্রিশ বছরের বেশি এই বৃত্তি ভোগ করেছিলেন। তবে ইংরেজদের কোনও রকম জ্বালাতন করার ইচ্ছা বা ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তবু মাঝে মাঝে গুজব রটত বিঠুর থেকে গোলমাল হবার সম্ভাবনা আছে। এসব কথা ইংরেজরাও বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করতেন না।

এইরকম একটি ব্যাপার ১৮৩২ সালে ঘটেছিল। মেজর হায়দার হার্সি তার নায়ক। বাজীরাওয়ের দেওয়ান রামচন্দ্র পন্তের কাছে একজন হরকরা চিঠি নিয়ে এল। তার চাপরাসে হার্সির নাম লেখা। রামচন্দ্র পন্ত খুব সাবধানী লোক। তিনি চিঠি নিলেন বটে কিন্তু খুললেন না, সরাসরি বিঠুরের কমিশনার জেমস ম্যানসনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ম্যানসন চিঠি খুলে দেখলেন যে সর্বনেশে ব্যাপার ঘটতে চলেছে। তিনিও বোধহয় আগে হার্সির নাম শোনেননি। কারণ গভর্নর-জেনারেলকে তিনি লিখলেন, কে একজন মেজর হার্সি চিঠি লিখেছেন, চিঠিতে বলেছেন তিনি বেরিলির লোক। চিঠিতে কতকগুলি সাংঘাতিক কথা আছে। হার্সি যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে তিনি মোটামুটি এই কথা বলেছিলেন—ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সনদ শেষ হয়ে যাবে। কোম্পানির অন্য কোনো অধিকার থাকবে না, কারণ ইংলন্ডের রাজা চতুর্থ উইলিয়াম নিজের হাতে তামাম হিন্দুস্তান নিয়ে নেবেন। কিছুদিন হল কোম্পানি সবাইয়ের মাইনে কমিয়ে দিচ্ছে। পেশোয়াকেও হয়তো এইরকম বিপদে পড়তে হবে। স্যার জন ম্যালকম তাঁর সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু ভবিষ্যতের ইংরেজরা কি পূর্ব-ব্যবস্থা মেনে চলবেন ? (অর্থাৎ তাঁর বৃত্তি কি ঠিক পাবেন ?) না-চলার সম্ভাবনাই বেশি। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার একটি পথ আছে। সে হচ্ছে পেশোয়া যেন বিলাতে কোম্পানির ডিরেক্টরদের কাছে চিঠি লিখে জানান যে, তিনি তাঁর বার্ষিক বৃত্তির আট লাখ টাকা ছেড়ে দেবেন। তার বদলে দাক্ষিণাত্যে তাঁকে একটি জায়গির দিতে হবে। তাছাড়া ইংরেজরা পুনা লুটপাট

করে অনেক ধনরত্ন বিলাতে পাঠিয়েছেন। যুদ্ধের সময় লুটপাট করে যে টাকা পাওয়া যায় সেটা বিজয়ীর প্রাপ্য। কিন্তু তার পরে যে টাকাপয়সা ধনরত্ন পুনা থেকে লুট করা হয়েছে তা বেআইনি হয়েছে। এই অর্থ ইংরেজের প্রাপ্য নয়। হার্সি প্রস্তাব করলেন যে, প্রথমে ডিরেক্টরদের এই সব কথা জানিয়ে চিঠি লেখা হোক। ডিরেক্টররা কর্ণপাত না করলে বোর্ড অব কন্ট্রোলকে ব্যাপারটি জানানো উচিত। ডিরেক্টরদের উপর তাঁদের ক্ষমতা আছে। তাতেও যদি কিছু না হয় তাহলে ইংলন্ডের রাজা চতুর্থ উইলিয়ামের কাছে আবেদন করা ছাড়া উপায় নেই। ইংলন্ডের রাজা নিশ্চয় এর একটা প্রতিবিধান তাড়াতাড়ি করবেন। ইংলন্ডের রাজাকে বলা হোক, যেসব ধনরত্ন পুনা থেকে কোম্পানির লোকরা নিয়ে গিয়েছে তার একটি বড় ভাগ তাঁকে দেওয়া হবে। দরকার হলে তার অর্ধেকও দেওয়া হতে পারে। এই লোভ দেখালেই তিনি রাজি না হয়ে পারবেন না।

হার্সি একথা বুঝতে পারেননি যে, ইংলন্ডের রাজাকে, একটু ঘুরিয়ে হলেও, এটা ঘুষের প্রস্তাব ছাড়া আর কিছু নয়। এর ফলাফল তাঁর পক্ষে ভাল হবে না। হার্সি আরও বলেছিলেন যে, তাঁর একজন বিচক্ষণ বন্ধু আছেন, তিনি এই চিঠি নিয়ে বিলাতে চলে যাবেন। রামচন্দ্র পন্ত এ প্রস্তাবে রাজি হলেই হার্সি বিঠুরে একজন ব্রাহ্মণ দূত পাঠাবেন। সে ইংরেজি ভাষা ভাল জানে। তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে সব ঠিক করা যেতে পারে।

খুব আশ্চর্যের কথা, হার্সি কখনও ভাবেননি যে, তিনি আপত্তিকর কথা লিখেছেন। গভর্নর-জেনারেল সব কথা শুনে আশ্চর্য হলেন, জানতে চাইলেন সত্যিই কি হার্সি এ-রকম কোনো চিঠি লিখেছেন? হার্সি এর যে জবাব দিলেন তাতে কমিশনার খুশি হলেন না। হার্সি খোলাখুলি তাঁকে বলেছিলেন যে, বাজীরাওয়ের ধনসম্পত্তি যা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিয়েছেন সেসব অবৈধ হয়েছে। তিনি নিজেও তো একজন ভুক্তভোগী। লর্ড ওয়েলেসলির সময় কোম্পানি তাঁকে

যেসব আশা দিয়েছিলেন তা পূর্ণ হয়নি। তিনি নিজে যে বৃত্তি পান তাও খুব কম। কমিশনার যেন এইসব কথা গভর্নর-জেনারেলকে জানান।

গভর্নর-জেনারেল এই সব কথা শুনে খুশি হলেন না। হার্সিকে খুব বকুনি দেওয়া হল। তিনি তো কোম্পানির নিমক খেয়েছেন, কোম্পানির কাছ থেকে পেনসন পান, তাঁর এসব কথা লেখা অন্যায় হয়েছে। আবার যদি এই ধরনের খবর গভর্নর-জেনারেলের কানে আসে তাহলে হার্সির পেনশন তো বন্ধ হবেই, আরও বেশি শাস্তি হতে পারে। হার্সি ধমক খেয়ে চুপ করে রইলেন।

হার্সি আর ভবিষ্যতে বিঠুরের কারুর সঙ্গে পত্রব্যবহার করেননি। তবে কখনও কখনও গুজব শোনা যত, অন্য কেউ কেউ বাজীরাওয়ের সঙ্গে মিলে অশান্তি করবার চেষ্টা করছে। সেসব বিশ্বাস করবার মতো কথা নয়। একবার সরকারের কাছে খবর গিয়েছিল শিবাজির বংশধর সাতারার রাজা প্রতাপসিং, যাঁকে ইংরেজরা পেশোয়ার হাত থেকে উদ্ধার করে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন, তিনি বাজীরাও, ব্রহ্মদেশের রাজা ও নেপালিদের সঙ্গে মিলে খুব বড়রকম অশান্তি করবার চেষ্টা করছেন। কেউ বিশ্বাস করেনি একথা। ইংরেজরাও নয়। সাতারার প্রতাপসিংয়ের রাজত্বের দিন অবশ্য শেষ হয়ে আসছিল। কিন্তু সে অন্য গল্প।

শেষ পেশোয়ার অন্তিম

১৮১৮ সালে লর্ড হেস্টিংস যখন বড়লাট তখন দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের পেশোয়াই শেষ হয়ে গিয়েছিল। মারাঠা যুদ্ধে হেরে গিয়ে তিনি স্যার জন ম্যালকমের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন।

স্যার জন ম্যালকম তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উপরের মহলে বিশ্বস্ত কর্মচারী। তিনি সরকারি দূত হয়ে দু'বার পারস্য দেশে গিয়েছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পলিটিক্যাল এজেন্ট ছিলেন। ইতিহাসের দুটি বই লিখেছিলেন, একটি পারস্যের ইতিহাস, আর একটি ভারতবর্ষের ইতিহাস। দুটি বই-ই বিখ্যাত।

পেশোয়ার সঙ্গে কোম্পানির শর্ত হয়েছিল যে, তিনি আর দাক্ষিণাত্যে ফিরতে পারবেন না, উত্তর ভারতবর্ষে কোনো জায়গায় বসবাস করতে হবে। কোথায় থাকবেন এই প্রশ্ন নিয়ে কিছুদিন আলোচনা চলেছিল। একবার কথা হয়েছিল যে, তিনি বারাণসী কিংবা মথুরায় থাকতে পারেন। বাজীরাও রাজি হলেন না। তিনি বললেন, তীর্থস্থানে থাকলে তাঁকে দিনে দু'তিন বার স্নান করতে হবে। তাঁর যা শরীর, তাতে এতবার স্নান করে তিনি বেশিদিন বাঁচবেন না।

শেষ পর্যন্ত বিঠুরে গিয়ে তিনি বাস করবেন ঠিক হল। বিঠুর

কানপুর থেকে মাইল দশেক দূরে। সেখানে থাকবার জন্য তাঁকে একটি জায়গির দেওয়া হল। তাঁর সঙ্গে অনেক লোকজন এসেছিল। বাজীরাওয়ের ভাতা কী হবে ? এই নিয়ে বহু আলোচনা করে ঠিক হল : বার্ষিক আট লক্ষ টাকা।

কেউ কেউ বললেন, এ তো অনেক টাকা। এত টাকা দেবার কোনো মানে হয় না। স্যার জন ম্যালকম বললেন, তা হোক, হাজার হলেও এক সময়কার পেশোয়া তো। আর তা ছাড়া আট লক্ষ টাকা শুনতে বেশি বটে, কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে এমন কিছু বেশি নয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এ-টাকা দেওয়াই উচিত। তাঁর যা শরীরের অবস্থা, কদিনই বা বাঁচবেন। বাজীরাও তাঁর বন্ধুবান্ধব, অনুচরদের নিয়ে বিঠুরে এসে বাসা বাঁধলেন। বিঠুরের পুরনো নাম 'ব্রহ্মাবর্ত'। পণ্ডিতরা বলতেন যে, বিঠুরের সামনে গঙ্গানদী হচ্ছে পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু। এ-কথা ভাল করে বোঝবার জন্য বিঠুরের ঘাটের কাছে জলের মধ্যে একটি জায়গা লোহার তার দিয়ে ঘেরা আছে। পেশোয়া এবার নদীতে স্নানে তাঁর আপত্তির কথা তোলেননি। পেশোয়ার সঙ্গে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন তাঁর পুরনো দেওয়ান রামচন্দ্র পন্ত। তিনি নিজেই প্রভুর সঙ্গে নির্বাসন নিয়েছিলেন।

নতুন জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পেশোয়ার খুব অসুবিধা হয়নি। উচ্চ আকাঙ্ক্ষাও তাঁর আর ছিল না। দান-ধ্যান করে তাঁর সময় কাটত। চারদিকের ব্রাহ্মণরা জানতেন যে, তিনি পেশোয়া না-থাকলেও তাঁর টাকাপয়সার অভাব নেই। ইচ্ছা করলেই অনেক টাকা দান করতে পারেন। ইংরেজরাও হয়তো চেয়েছিলেন যে, এই সব নিয়ে পেশোয়া তাঁর আগের জীবন ভুলে থাকতে পারবেন। ব্রাহ্মণদের অনেক টাকা দিতেন। নানারকম ধর্মীয় আচার পালন করতেন। কিন্তু তাই বলে তাঁকে পুণ্যবান মনে করা ঠিক হবে না। আসলে বাইরের ধর্মাচরণে ত্রুটি না-থাকলেও তাঁর নিজের চরিত্রে

অনেক দোষ ছিল। তাঁর ধর্মীয় আচরণ কী রকম ছিল সে সম্বন্ধে একটি গল্প বলি। পেশোয়ার বৃত্তির টাকা কানপুর থেকে আসত মিছিল করে। পেশোয়ার একটি সুন্দর পালকি ছিল, মখমল কিংখাব এই সব দিয়ে ভিতরটা সাজানো। টাকা আনবার সময় এই পালকি ব্যবহার করা হত। একবার টাকা ভর্তি এই পালকি একজন ছুঁয়ে দিয়েছিল। বাজীরাও বললেন যদি নিচু হাতের ছোঁয়া লেগে থাকে তাহলে পালকি তো অপবিত্র হয়েছে। দোষ স্খালনের জন্য টাকাসুদ্ধ পালকিটিকে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে রাখা হল। তারপর যখন উপরে তোলা হল, দেখা গেল পালকির সাজসজ্জা সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তখনকার টাকা তো রুপোর, কাজেই টাকার কিছু হয়নি। শুধু গঙ্গাজলে কিছুক্ষণ ডুবে থেকে পবিত্র হয়ে গিয়েছে।

পুজোআর্চা, দান-ধ্যান ছাড়া বাজীরাওয়ের আর কোনো কাজ ছিল না। নিরবচ্ছিন্ন আলস্য ও আরামে শরীর ভাল থাকে না। কিন্তু বাজীরাও এইভাবে থাকতেই ভালবাসতেন। পূর্বে দশহরার ঠিক পরে মারাঠি সৈন্যরা যুদ্ধ করতে বের হতেন। তখন বৃষ্টি থেমেছে, অশ্বারোহীর পথে অসুবিধা হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। ছত্রপতি শিবাজির সময় থেকে এই রীতি চলে আসছিল। এখনও যাঁরা ঐতিহ্য মেনে চলতে চান, তাঁরা দশহরার দিন বিকালে গ্রামের বাইরে হেঁটে যান। পুনের কাছে দেখেছি একরকম ছোট গাছ আছে, সেই গাছের পাতা ছিড়ে আনতে হয়। তার অর্থ : শত্রুর দেশ থেকে সোনা জয় করে আনা হল। বাজীরাও আস্তে-আস্তে এই প্রথাও ছেড়ে দিলেন। এমনকি, ঘোড়াও চড়তেন না। কোথাও যেতে হলে পালকি ব্যবহার করতেন।

বাজীরাওয়ের শরীর যখন ভেঙে পড়ছে, তখন কমিশনারের হুকুমে তাঁর জিনিসপত্রের একটা ফর্দ করা হল। ঠিক হল, পেশোয়ার মৃত্যু হবার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর প্রাসাদের যে-অংশে ধনরত্ন রাখা হয়, সেই অংশ বন্ধ করে রাখতে হবে, সেই সঙ্গে কড়া পাহারার ব্যবস্থা। তাঁর

সম্পত্তি মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীদের বিতরণ করা হবে। এ তাঁর নিজের সম্পত্তি।

পরের বছর বাজীরাওয়ের পক্ষাঘাতের আক্রমণ হল, কিন্তু ক্রমে তিনি অনেকটা সেরে উঠলেন। ছ'বছর পরে, ১৮৪৭ সালে কমিশনার সরকারকে জানালেন, বাজীরাওয়ের বয়স এখন ৭৩ বছর পূর্ণ, খুব দুর্বল, দৃষ্টিশক্তি গিয়েছে। তবু আরও প্রায় চার বছর তিনি বেঁচে ছিলেন। ১৮৫১ সালের জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কানপুর থেকে দু'জন ইংরেজ ডাক্তার তাঁকে দেখতে এলেন। তাঁরা পরীক্ষা করে বললেন, বাজীরাওয়ের অবস্থা খুব খারাপ। তবে ঠিকমতো চিকিৎসায় তিনি এবারও বেঁচে যেতে পারেন। সেই রাত্রে মনে হল বাজীরাওয়ের অন্তিম সময় উপস্থিত। কানপুর থেকে কমিশনার এলেন। তাঁর মনে হয়েছিল তখনই বিপদের আশঙ্কা নেই। তিনি ঠিক বুঝতে পারেননি। পরদিন ২৮ জানুয়ারি সকালে বাজীরাও শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি বিশেষ অধ্যায় শেষ হয়ে গেল।

বিঠুরে শেষ পেশোয়ার জন্য যে ব্যবস্থা ছিল, তাড়াতাড়ি তা গুটিয়ে ফেলা হল। অল্পদিন পরেই বিঠুর খালি হতে আরম্ভ করল। বাজীরাওয়ের কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। তাই দুই দত্তকপুত্র নিয়েছিলেন : ধন্দুপন্ত নানাসাহেব ও দাদাসাহেব। নানাসাহেব আশা করেছিলেন, তাঁকে সরকার কিছু ভাতা দিতে পারেন। সে-আশা সফল হয়নি।

পেশোয়াকে যখন ভাতা দেবার সিদ্ধান্ত হয়েছিল, তখন সবাই ভেবেছিলেন তিনি বেশি দিন বাঁচবেন না। কিন্তু শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে তিনি আরও ৩৫ বছর বেঁচেছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তারা ভাবতে শুরু করলেন, এত বেশি টাকা বৃত্তি দেওয়াই ভুল হয়েছিল। কিন্তু কেউ কেউ মনে করতে লাগলেন, তিনি যে এতদিন বেঁচে আছেন সেও যেন স্যার জন ম্যালকমের দোষ। তাঁর কথাতেই এত

টাকা দিতে হল। অনেকদিন না-বাঁচলে কোম্পানির এত টাকা খরচ হত না। বাজীরাওয়ের খবরদারি করবার জন্য কমিশনার-পদের সৃষ্টি করা হয়েছিল। প্রথম কমিশনার ছিলেন স্যার জন লো। মারাঠা যুদ্ধের সময় বাজীরাওয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। প্রথম কমিশনারের কাজ কঠিন ছিল। কিন্তু অনেকটা তাঁর জন্যই বাজীরাওয়ের বন্দীদশা মানিয়ে নেওয়া সহজ হয়েছিল।

স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে, এই কারণে স্যার জন লো ছুটি নিয়ে দেশের বাইরে চলে গিয়েছিলেন। প্রথমে গিয়েছিলেন সেন্ট হেলেনা দ্বীপে, যেখানে কিছুকাল আগে নেপোলিয়নকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। সেখানে যিনি নেপোলিয়নের খবরদারি করতেন, তাঁর নামও ছিল লো। স্যার হাডসন লো। তাঁকে নেপোলিয়ন একদম পছন্দ করতেন না। তিনি এলেই তাঁকে বলে পাঠানো হত, "এখন দেখা হবে না, সম্রাট স্নানের ঘরে আছেন।" জন লো'র সঙ্গে পেশোয়ার সম্পর্ক অবশ্য সে-রকম ছিল না।

জন লো ছুটি থেকে ফিরে এসে জয়পুরে রেসিডেন্ট হয়ে বদলি হয়ে গেলেন। পরে আরও দুজন কমিশনার আসেন। তারও পরে জেম্‌স ম্যানসন বিঠুরের কাজের ভার নেন। বাজীরাওয়ের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বিঠুরের কমিশনার ছিলেন। ম্যানসনের মনে হয়েছিল, বাজীরাওয়ের দিন ফুরিয়ে এসেছে। বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পরে তাঁর দত্তকপুত্র বৃত্তির জন্য আবেদন করেন, কিন্তু তা অগ্রাহ্য হয়। ভাবখানা এই যে, অনেক দেওয়া হয়েছে, আর নয়। তবে বিঠুরের জায়গিরে নানাসাহেবকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে তাঁর প্রাসাদের শুধু ধ্বংসাবশেষই এখন আছে। সিপাহি-যুদ্ধের সময় বিঠুরে ইংরেজ সৈন্যর সঙ্গে নানাসাহেবের যুদ্ধ হয়েছিল। ইংরেজ সৈন্যরা কামানের গোলায় বাজীরাওয়ের প্রাসাদ চূর্ণ করে দেয়।

কুড়ি-একুশ বছর আগে বিঠুরে গিয়ে দেখেছি, অনেকটা জায়গায় ভাঙা ইঁটের স্তূপ। সেখানে কিছু-কিছু জায়গায় চাষ হচ্ছে, বাকিটা জঙ্গল। এইরকম জায়গা সাপের খুব প্রিয়। সাপের জন্য গ্রামের

লোক সেখানে ঢুকতে সাহস পায় না। একটু দূরে রামচন্দ্র পন্তের বাড়ি। গ্রামের লোকেরা বলেছিল, বাড়িটা ভূতুড়ে। আমি দেখলুম, বাড়ি তখন মেরামত হচ্ছে। সেখানে স্কুল বসবে। নদীর ধারে একসারি শিবমন্দির। দেখলে বাংলাদেশের মন্দির বলে মনে হয়। বাজীরাও কোথা থেকে লোক নিয়ে গিয়ে মন্দির বানিয়েছিলেন, জানি না। সব মন্দির পরিত্যক্ত। পূজা হয় না কোথাও, আলো জ্বলে না। গ্রাম থেকে দু'একজন লোক আমার সঙ্গে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন বলল, একটি মন্দিরেই শুধু পূজা হত। মন্দিরের পুরোহিত একটি সাপ পুষেছিল। তাকে দুধ খাওয়াত। একদিন সন্ধ্যায় সে দুধ খাওয়াতে এসে সাপকে দেখতে পায়নি, ভুল করে সাপের গায়ে পা লেগে গিয়েছিল। তৎক্ষণাৎ সাপ তাকে কামড়ে দিল। বাঁচানো গেল না।

এই বলে লোকটি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "সাহেব, তুমি কিন্তু কখনও সাপ পুষো না। যতই পোষ মানুক না কেন, একদিন না একদিন সে তোমাকে কাটবেই।"

নানারকম নানাসাহেব

সিপাহি-যুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ১৮৫৮ সালের ডিসেম্বর মাস। তখন নানাসাহেব, তাঁর ভাই বালাসাহেব, অযোধ্যার বেগম হজরতমহল ও আরও কয়েকজন নেতা নানা জায়গায় পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রধান সেনাপতি ক্লাইডের সৈন্যরা রাপ্তি নদীর কাছে নানাসাহেবকে তাড়িয়ে নিয়ে এলেন। ইচ্ছা ছিল ধরে নিয়ে আসবেন। কিন্তু কোম্পানির সৈন্যের তাড়া খেয়ে নানাসাহেব, তাঁর সঙ্গীরা ও কয়েক হাজার লোক নেপালে ঢুকে পড়লেন। নানাসাহবের সঙ্গে আটটি হাতি ধনরত্নে বোঝাই।

নেপালে ঢুকে যাবার পরে নানার কী হল ? বলা খুব মুশকিল। নেপালের মন্ত্রী রানা জঙ্গবাহাদুর নাকি নানাকে বললেন, তোমাকে আমি ধরিয়ে দেব না। কিন্তু তোমার স্ত্রী কাশীবাঈকে, ও যা গয়নাগাঁটি এনেছ, সব আমার কাছে রেখে যেতে হবে। নানাসাহেব প্রথমটায় ইতস্তত করছিলেন। তারপর দেখলেন, তাঁর রাজি হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। নানাসাহেব যত ধনরত্ন, গহনা ইত্যাদি নিয়ে এসেছিলেন তার মধ্যে সবচেয়ে দামি ও বিখ্যাত ছিল 'নওলখা হার' ; খুব দামী হীরে, মণি, মুক্তো, পান্না এইসব দিয়ে তৈরি। তার বদলে রানা কাশীবাঈকে একটা বাড়ি তৈরি করিয়ে

দিলেন। কিছু সম্পত্তিও দিয়েছিলেন।

বছরখানেক আর বিশেষ কিছু শোনা যায়নি। নেপালের তরাই অঞ্চলে খুব ম্যালেরিয়া। ইংরেজরা খবর পেতে লাগলেন, নানাসাহেবের ভাই বালাসাহেব ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগে মারা গেছেন, তার মাসখানেকের মধ্যে নানাসাহেবও গত হয়েছেন। এ-রকম হওয়া অসম্ভব ছিল না। ব্যাপারটা কিন্তু অত সহজে মিটল না। মাঝে-মাঝে খবর আসতে লাগল, নানাসাহেব অথবা নানাসাহেবের মতো একটি লোককে নেপালের এখানে-ওখানে দেখা যাচ্ছে। নানারকম খবর। কেউ বলছে, নানাসাহেবের তখন খুব দুরবস্থা, সঙ্গে মাত্র একটি লোক। কেউ বলেছে, নানাসাহেবকে দেখলাম, সঙ্গে ত্রিশ-চল্লিশ জন গেরুয়া-পরা লোক, তারা কিন্তু আসলে সন্ন্যাসী নাও হতে পারে। আর একজন বলেছিল, সে নানাসাহেবকে দেখেছে, সঙ্গে কয়েক হাজার লোক, কয়েকটি হাতি আর ত্রিশটি কামান। আর একজন বলেছিল, লোকটি খুব দানধ্যান করেন। দিনে কয়েকবার পুজো-আচ্চা করেন। তাঁর পুজোর বাসন সোনা আর রুপো দিয়ে তৈরি। এইসব গল্প কতটা সত্যি কতটা মিথ্যে, বুঝে ওঠা মুশকিল। নেপালের রানা জঙ্গবাহাদুর প্রথম-প্রথম বলতেন, নানাসাহেব বেঁচে নেই। পরে তাঁরও মত বদলে গেল। তিনি ইংরেজদের বলে পাঠালেন যে, নানার ভাই যে মারা গিয়েছে, তাতে তাঁর কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু নানা সম্বন্ধে তিনি জানেন না কী হয়েছে। হয়তো বেঁচে আছেন, অন্য কোথাও চলে গিয়েছেন।

১৮৬২ সাল থেকে নানারকম গোলমেলে খবর শোনা যেতে লাগল। হরজি ব্রহ্মচারী নামে একজন করাচিতে ধরা পড়লেন। সঙ্গে তাঁর এক বন্ধু, নাম ব্রজদাস। কারও কারও ধারণা হল, হরজি ব্রহ্মচারী আর কেউ নন, নানাসাহেব স্বয়ং। ছদ্মবেশে ঘুরছিলেন। হরজি ব্রহ্মচারীর শরীরের অবস্থা তখন খুব খারাপ। তাঁকে জাহাজে করে কলকাতায় নিয়ে এসে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হল।

হরজি ব্রহ্মচারী কয়েকদিন ভুগে সেখানে মারা গেলেন। এটা যে ইংরেজ পুলিশের মারাত্মক ভুল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। পরে জানা গেল, হরজি ব্রহ্মচারী ধর্মীয় বই লিখতেন। হরজি ব্রহ্মচারীর বন্ধু ছাড়া পেয়ে গেলেন।

এরপরে যে ঘটনা ঘটল, সে আরও বেশি চমকপ্রদ। আজমিঢ়ে আবার আর-এক 'নানাসাহেব' ধরা পড়লেন। সেখানকার ডেপুটি কমিশনার মেজর ডেভিডসন সাহেবের কাছে খবর এল যে, নানাসাহেব আজমিঢ়ে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে কয়েকদিন আগে পর্যন্ত এক হাজার সৈন্য ছিল। তারা অন্যত্র চলে গিয়েছে। আজমিঢ় থেকে একটি লোককে নানা মনে করে ধরে নিয়ে আসা হল। নানাসাহেবকে গ্রেপ্তার করবার জন্য যে হুলিয়া বের করা হয়েছিল, তার সঙ্গে লোকটির চেহারা মিলিয়ে নিয়ে ডেভিডসন ও আজমিঢ়ের সিভিল সার্জন দু'জনেরই বিশ্বাস হল, এ ব্যক্তি নানাসাহেব না হয়ে যায় না। চেহারায় কিছু গরমিল আছে বটে, কিন্তু এতদিন ধরে নেপালের পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরলে ওরকম তো হতেই পারে। আগে বেশ মোটাসোটা ছিলেন, এখন রোগা হয়ে গিয়েছেন। নানাসাহেবের ফোটোগ্রাফ তুলে তিনজনের কাছে পাঠানো হল। তাঁরা আগে নানাকে ভাল করে চিনতেন। একজন হলেন বারাণসীর ডঃ চিক্ আর দু'জন হলেন মিরাট ও ফৈজাবাদের সামরিক কর্মচারী। ডঃ চিক্ নানাকে অনেকবার দেখেছেন, তিনি ফোটোগ্রাফ দেখে বললেন, এ কখনও নানাসাহেব হতে পারে না। তারপর বন্দীকে যখন কানপুরে তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া হল, তখন বললেন, এঁর গলার স্বর আলাদা, নানার চেয়ে গায়ের রং কালো, এবং নানার তখন যে বয়স হওয়া উচিত ছিল, এঁর বয়স তার চেয়ে বছর-পনেরো বেশি। কানপুরের আগেকার সিভিল সার্জন নানাসাহেবকে এক সময় চিকিৎসা করেছিলেন। তিনি বললেন, নানার সঙ্গে এঁর চেহারার কিছু মিল থাকতে পারে, কিন্তু এই লোক নানাসাহেব নন। খবরের

কাগজে কিছুদিন উত্তেজিত আলোচনা চলবার পর ব্যাপারটা চাপা পড়ে গেল।

আবার শোনা গেল, মেবারে একজন নানাসাহেবকে পাওয়া গিয়েছে। কিছুদিন পর শোনা গেল, কানপুরে। সেখানে তিনি নাকি সিন্ধিয়ার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। সিন্ধিয়া তাঁকে নিজের প্রাসাদে নিয়ে এলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে সিন্ধিয়ার বিশ্বাস হল, তিনি নানাসাহেব। তিনি তাঁকে ইংরেজদের হাতে ধরিয়ে দিলেন। আবার কানপুরে নিয়ে এসে নানাকে পরীক্ষা করা হল। সেখানে একজন ইংরেজ ডাক্তার বললেন যে, যদিও তিনি নানাকে আগে চিকিৎসা করেছেন, তাহলেও ঠিক চিনতে পারছেন না। আসল নানাসাহেবের চেয়ে এঁর বয়স তো অনেক কম মনে হচ্ছে।

মওব্রে টমসন নামে কানপুরে একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক নানাকে বার দুয়েক দেখেছিলেন। আগেকার আর-এক ইংরেজ সাক্ষীর সঙ্গে তাঁর মতের মিল হল। তিনিও বললেন, এঁর গলার স্বর অন্যরকম। নানাসাহেবের সুখের দিনে তিনি যাঁকে নানাসাহেব বলে জানতেন, তাঁর চেয়ে এঁর চেহারা তো অন্য রকম। তার উপর এঁর মুখে বড় দাড়িগোঁফ, কামিয়ে ফেললে বোধহয় চেনার সুবিধা হবে। নাপিত ডেকে দাড়ি কামিয়ে ফেলা হল, তারপরে মহারাষ্ট্রীয় পোশাকও পরিয়ে দেখা হল। মওব্রে টমসন নিজের মন বুঝতে পারেননি। কামাবার পর বললেন, চেহারার তো বেশ কিছু মিল আছে দেখছি, একটা কাটা দাগও মিলে যাচ্ছে, কিন্তু একথা কী করে বলব যে, এই লোক নানাসাহেব ? অনেকেই সিন্ধিয়ার প্রাসাদে এসে বন্দীকে দেখেছিলেন। একজন বললেন, "আরে, এঁকে আমরা চিনি, এঁর নাম তো যমুনা দাস। যমুনা দাস আবার কী করে নানাসাহেব হবেন ?"

অন্য উদাহরণও আছে। আপ্টে পরিবারের সঙ্গে নানাসাহেবের পরিবারের কুটুম্বিতা ছিল। সম্পর্কে বাবা আপ্টের ছেলে ছিলেন

নানাসাহেবের জামাই। তাঁরও তখন বয়স হয়েছে। তাঁকে নানাসাহেবের কাছে নিয়ে আসা হল। তিনি পকেট থেকে চশমা বার করে পরলেন ; তারপর কিছুক্ষণ বন্দীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আরে, তুমিই তো নানাসাহেব!" ব্যাপারটা খুব নাটকীয়। পরে আপ্টেই বলেছিলেন, লোকটি নানাসাহেব হতে পারেন না। তাঁর বুঝবার ভুল হয়েছিল।

এ-গল্পের এখানেই শেষ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এর পরেও আর একটি ছোট কাহিনী আছে। ল্যানডন নামে এক সাহেব সিপাহি-বিদ্রোহের পঞ্চাশ বছর পরে নেপালের একটি ইতিহাস লেখেন। নেপাল সরকার তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর লেখা বইয়ে একটি উপসংহার আছে। সেটি বলে এ-কাহিনী শেষ করব। ল্যানডন লিখছেন, রাজকোট থেকে মাইল-ত্রিশ দূরে একটি ছোট শহরে এক ভিখিরি ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার বেশ বয়স হয়েছে। গায়ের পোশাক জীর্ণ। বিড়বিড় করে বলছে, "আমি নানাসাহেব। নেপালের জঙ্গবাহাদুর আমার সব কেড়ে নিয়েছে। এর বিচার চাই।" তার পিছনে একদল ছেলে। কেউ কেউ চলতে চলতে তার গায়ে ঢিল ছুঁড়ছে। আরও নানা রকমে তাকে উত্ত্যক্ত করছে। এই অবস্থা দেখে একজন পুলিশের দয়া হল। ছেলেদের অত্যাচার আরও বাড়তে পারে এই মনে করে তাকে রাত্তিরের মতো গারদখানায় রেখে দেওয়া হল। রাত্রে ভিখিরিটির খুব জ্বর এল। জ্বরের মধ্যে সে বলতে থাকে, "আমি নানাসাহেব, বিঠুরের নানাসাহেব।" ১৮৫৭-৫৮ সালে যেসব ঘটনা সিপাহি-যুদ্ধের সময় হয়েছিল, তার টুকরো টুকরো বিবরণ সে জ্বরের ঝোঁকে বলতে লাগল। এই যদি সত্যি নানাসাহেব হয়, এই কথা ভেবে প্রহরীরা তাদের উপরওলাকে ডেকে নিয়ে এল। উপরওলা একজন অল্পবয়সের ইংরেজ। তিনি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ভিখিরির কথাবার্তা শুনতে লাগলেন। শুনে বিশ্বাস হল, এতদিন পরে সত্যিকারের

নানাসাহেব ধরা পড়লেন। কলকাতায় ভারত সরকারের কাছে টেলিগ্রাম করা হল। কর্মচারীটির মনে অনেক আশা : পুরস্কার খ্যাতি চাকরির উন্নতি। কলকাতায় পাঠানো টেলিগ্রামে ছিল, "নানাসাহেবকে গ্রেপ্তার করেছি, এখন কী করব?" পরদিন টেলিগ্রামে যে জবাব এল, তাতে তিনি মুষড়ে পড়লেন। জবাবে লেখা, "তাকে ছেড়ে দাও।"

এই হচ্ছে নানাসাহেব সম্বন্ধে বোধহয় শেষ কাহিনী। সরকার অনেকদিন থেকেই নানাসাহেবের গ্রেপ্তারের ভুল খবরে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। নানাসাহেব সম্বন্ধে অনেক ভুল খবর পেতে পেতে এক উঁচুতলার কর্মচারী বলেছিলেন, "ইচ্ছা হয় নানাসাহেবের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে এদেশ থেকে চলে যাই!"

বেগমের বরাদ্দ পাঁচ টাকা

সিপাহি-বিদ্রোহের প্রায় পঁচিশ বছর পরে, ১৮৮১ সালে, ভারত সরকার একটি আবেদনপত্র পেলেন। আবেদন করেছেন শাহজাদা ফিরোজ শাহর বিধবা। মক্কা শহরে তাঁর স্বামী শাহজাদা ফিরোজ শাহর মৃত্যু হয়েছে। তিনি সরকারের কাছ থেকে সাহায্য চেয়েছেন। ফিরোজ শাহর নাম খুব বেশি লোকের কাছে পরিচিত নয়। দিল্লির সম্রাট-বংশে তাঁরজন্ম।আওরঙ্গজেবের পুত্র, যিনি প্রথম বাহাদুর শাহ নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেছিলেন, ফিরোজ শাহ তাঁর বংশের সন্তান। হয়তো সিংহাসনে বসতে পারতেন, কিন্তু তাহলে বোধহয় এতদিন বেঁচে থাকতেন না। প্রথম বাহাদুর শাহর মৃত্যুর পরে দিল্লির সিংহাসন নিয়ে নানারকম রাজনৈতিক খেলা চলছিল। ফিরোজ শাহর বাবার নাম আমরা জানি, নিজাম বখ্‌ত। যে কর্মচারীর হাতে এই দরখাস্তটি পড়েছিল, তিনি নিশ্চয়ই এত খবর জানতেন না, তাই দরখাস্তের উপর লিখে দিলেন, মাসিক পাঁচ টাকা মঞ্জুর। এই দেশ যখন ক্রমশ ইংরেজদের অধিকারে আসে, তখন তারা আগেকার রাজাদের বৃত্তি দিতে কৃপণতা করেনি। দ্বিতীয় বাজীরাও পেশোয়া তো বছরে আট লাখ টাকা বৃত্তি পেতেন। অনেকে তখন মনে করেছিলেন যে, বেশি দেওয়া হচ্ছে, এর চেয়ে কম দেওয়া উচিত।

ইংরেজের কাছে হাজার টাকার বেশি বৃত্তি পেতেন এরকম রাজা কিংবা নবাব সংখ্যায় কম ছিলেন না। তখনকার দিনে সামান্য সিপাহিদের মাইনেও ছ'সাত টাকার কম হত না। কর্মচারীটি সম্ভবত এসব কথা ভেবে দেখেননি। যা হোক, লর্ড রিপন যখন বড়লাট হয়ে এলেন তখন তিনি এই ভুল খানিকটা সংশোধন করেছিলেন। তিনি ফিরোজ শাহর বেগমকে ভাতা বাড়িয়ে মাসিক একশো টাকা করেছিলেন, দরখাস্তের সময় থেকেই এই হারে দেওয়া হবে।

কাউকে দোষ দেওয়া উচিত হবে না। ইতিহাসে শাহজাদা ফিরোজ শাহ প্রায় অজ্ঞাত পুরুষ। কোনো কোনো ইতিহাসে তাঁর নামের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাঁর ছবি কখনও স্পষ্ট হয়নি। সিপাহি-যুদ্ধের কিছুদিন আগে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উত্তর ভারতে বেড়াতে গিয়েছিলেন, যেমন তিনি মাঝে-মাঝে যেতেন। দিল্লিতে যমুনা নদী দিয়ে নৌকোয় যেতে-যেতে দেখলেন, লালকেল্লার পিছন দিকে প্রাসাদের ছাতে বাদশাহ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন। বাদশাহর ঘুড়ি ওড়ানো দেখতে কিছু ভিড় জমেছিল। মহর্ষির আত্মজীবনী পড়লে মনে হয় যে, ঘটনাটি তাঁর কাছে একটু আশ্চর্য মনে হয়েছিল, কিন্তু তিনি এ-কথাও ভেবেছিলেন যে, তাতে ক্ষতি কী ? বাদশা তো তখন ইংরেজদের হাতের পুতুল। ঘুড়ি ওড়ানো ছাড়া তাঁর আর কী কাজ থাকতে পারে ? আসল কথা, ঘটনার স্রোত কোন্‌দিকে যাচ্ছে, সে সম্বন্ধে কারুর কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না।

১৮৫৭ সালের মে মাসে সিপাহি- যুদ্ধ যখন আরম্ভ হল, ফিরোজ শাহ তখন মক্কায় তীর্থ করছিলেন। বোম্বাই এসে সে-কথা শুনলেন। মিরাট থেকে একদল সিপাহি বিদ্রোহ করে দিল্লি এসে পৌঁছল। সম্রাট বাহাদুর শাহকে জানানো হল, ইংরেজদের বিরুদ্ধে তামাম হিন্দুস্থান লড়াই করবে, সম্রাট তাদের নেতা হবেন। বাহাদুর শাহ এমন বিপদে আর কখনও পড়েননি। কবিতা লিখে, পাখি পুষে, ঘুড়ি উড়িয়ে তাঁর দিন কেটেছে। তিনি কিছু বুঝতে না পেরে, যে ইংরেজ

কর্মচারী তাঁর সঙ্গে থাকতেন তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তিনি আসামাত্র সিপাহিদের হাতে খুন হয়ে গেলেন। এক বছরেরও বেশি পরে দিল্লি আবার ইংরেজদের হাতে এল। বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে বন্দী করে রেঙ্গুনে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তাঁর কয়েকজন ছেলেকে হাডসন সাহেব বন্দী করে নিয়ে আসছিলেন, রাস্তায় গাড়ি থেকে নামিয়ে তাদের খুন করলেন।

ফিরোজ শাহ ইতিমধ্যে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রথম দিকে তিনি সীতামৌ আক্রমণ করলেন। সেখান থেকে মান্দাসোর। মান্দাসোরে গিয়ে তিনি প্রচার করে দিলেন, ইংরেজদের বিরুদ্ধে তিনি ধর্মযুদ্ধ শুরু করেছেন, একজন প্রধানমন্ত্রীও বহাল করলেন। সিপাহিরা তাঁর চারদিকে এসে জড়ো হতে লাগল। ফিরোজ শাহ ভাবলেন, এবার তাঁকে সিপাহিদের একজন প্রধান নেতা বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তিনি চারপাশের কোনো কোনো রাজা বা ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকে চিঠি লিখলেন এই আশায় যে, তাঁরা তাড়াতাড়ি তাঁর সঙ্গে এসে যোগ দেবেন। তখন তাঁর সৈন্যসংখ্যা অন্তত সতেরো-আঠারো হাজার হয়েছিল। কিন্তু এ-অবস্থা বেশিদিন থাকল না। স্যার হেনরি ডুরাণ্ডের কাছে পরাজিত হবার পর দ্রুত পতন হতে লাগল। দলের লোকেরা তাঁকে ছেড়ে চলে যেতে লাগল। কিছুদিন তিনি মধ্যপ্রদেশের এক জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করেছিলেন। কিন্তু ইংরেজ সৈন্যের তাড়া খেয়ে সে-আশ্রয়ও তাঁকে ছাড়তে হয়। ফিরোজ শাহর সেনাবাহিনীর অতি অল্পই অবশিষ্ট ছিল। ফিরোজ শাহ ও তাঁর দুই বন্ধু পাণ্ডুরঙ্গ সদাশিব রাওসাহেব ও তাঁতিয়া টোপি, এই তিনজনের সৈন্যসংখ্যা মিলিয়ে দু'হাজার হবে কিনা সন্দেহ। অবস্থা এরকম দাঁড়াল যে, তাঁরা আর একসঙ্গে থাকা নিরাপদ মনে করলেন না। একসঙ্গে থাকলে ইংরেজের হাতে ধরা পড়ার সম্ভাবনা বেশি, কাজেই তাঁরা যে-যার সৈন্য নিয়ে আলাদা হয়ে গেলেন। তাতেও সুবিধা হল না। তাঁতিয়া টোপিকে তাঁর বন্ধু মান

সিং বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরেজের হাতে ধরিয়ে দিলেন। রাওসাহেবও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, তাঁরও সেই পরিণতি হল। কিছুদিন আগে মহারানী ভিক্টোরিয়া এক ঘোষণাপত্র প্রচার করেছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল, যাঁরা ইংরেজদের রক্তপাত করেননি, তাঁদের প্রাণের ভয় নেই। তাঁতিয়া টোপি ও রাওসাহেব দু'জনেই বলেছিলেন যে, ইংরেজদের হত্যার জন্য তাঁরা কেউই দায়ী নন। ইংরেজরা একথা বিশ্বাস করেনি। তাঁতিয়া টোপি ও রাওসাহেবের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার লোকের অভাব হয়নি। ফিরোজ শাহর মনে হল, তাঁর পক্ষে দেশ ছেড়ে যাওয়াই মঙ্গল। ইংরেজরা। বলেছিলেন যে, ফিরোজ শাহকে যদি শাস্তি দেওয়া নাও হয় তাহলেও তাঁকে নিজের ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াতে দেওয়া হবে না। ইংরেজ সরকার ঠিক করে দেবেন তিনি কোথায় থাকবেন। ফিরোজ শাহ এই শর্তে রাজি হলেন না। বিদ্রোহের সূত্রপাতে যেমন হঠাৎ আরব দেশ থেকে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, সেইরকম একদিন আবার ভারতবর্ষ ছেড়ে আরব দেশে চলে গেলেন। যাবার আগে তিনি তাঁর এক কর্মচারীকে চিঠি লিখেছিলেন। তাঁর ভাষা এমন যে, পড়লে মনে হয় তিনি যেন দিল্লির বাদশা। ইংরেজদের ধারণা হয়েছিল, এমন দুর্বিনীত লোকের সঙ্গে আলোচনায় ফল হবে না।

এর পরে ফিরোজ শাহ সম্বন্ধে নানারকম খবর রটতে লাগল। ১৮৬০ সালে শোনা গেল, ফিরোজ শাহকে কান্দাহারে দেখা গিয়েছে। পরের বছর বোখারাতে। আবার কয়েক বছর পরে কাবুলে। তখন সিপাহি-বিদ্রোহের উত্তাপ ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। ফিরোজ শাহ তাঁর রাজ্যে বাস করবেন এটা কাবুলের আমির ভাল চোখে দেখেননি। ১৮৭২ সালে ফিরোজ শাহকে কনস্টেনটিনোপ্‌লে (এখন ইস্তাম্বুল) দেখা গিয়েছিল। নানা সময়ে নানা দেশ থেকে তাঁর সম্বন্ধে খবর আসতে লাগল। সব খবরই যে সত্যি, তা নাও হতে পারে।

সরকারি কাগজপত্র ঘাঁটলে দেখা যাবে, কিছু ভারতীয় তখন দেশ ছেড়ে আরবের বিভিন্ন শহরে কিংবা তুর্কি দেশে বসতি করতেন। তার মধ্যে বেশিরভাগই সিপাহি-যুদ্ধের সময় দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা সাধারণ মানুষ, খুব যে বড় চাকরি বা ব্যবসা করতেন, তা নয়। একজন ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনীর ডাক্তার। তিনি এদেশে এসে হাকিমি ব্যবসা করতেন। একজনের ছিল সোনারুপোর গয়নার দোকান। আর একজন চীন দেশ থেকে আমদানি করা জিনিসের ব্যবসা করতেন। কেউ কেউ সাধারণ ফেরিওয়ালা। একজন নিজেকে বলতেন 'পীর'। তিনি মাদুলি বেচতেন। অনেকের বিশ্বাস ছিল, এই মাদুলিতে খুব কাজ হয়। এঁরা অনেকে ফিরোজ শাহকে নেতা বলে মানতেন। একজন ইংরেজ কর্মচারী ১৮৭৫ সালে লিখেছেন যে, তাঁর বিশ্বাসী এক লোক ফিরোজ শাহকে দেখেছেন। তাঁর মতে ফিরোজ শাহ কিছুকাল ইস্তাম্বুলে থাকার পর মক্কা চলে গিয়েছেন। তখন ফিরোজ শাহর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। এক চোখে ভাল দেখতে পান না, একটু খুঁড়িয়ে চলতে হত। সম্ভবত অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে ও পথক্লেশে তাঁর শরীর ভেঙে পড়েছিল। তাঁর বয়স তখন পঞ্চাশের নীচে। যতদিন ফিরোজ শাহ বেঁচে ছিলেন, ইংরেজরা তাঁর উপর নজর রেখেছিল। খবর আছে, ফিরোজ শাহর ইচ্ছা ছিল যে, পশ্চিম এশিয়ার মুসলমান রাজ্যগুলিকে এক করে আবার ইংরেজদের সঙ্গে লড়বেন। দিল্লির বাদশাহি তাঁর কাছে আবার ফিরে আসবে।

ফিরোজ শাহর শেষের জীবন খুব কষ্টে কেটেছিল, প্রায় ভিখিরি হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বাদশাহির স্বপ্ন তিনি ছাড়তে পারেননি। কী করে তাঁর দিন চলত, ইংরেজরা সে-খবরও বের করেছিলেন। আবদার রহমান নামে এক ভারতীয় মুসলমানের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন ফিরোজ শাহ। শ্বশুরের সঙ্গেই থাকতেন। হতাশা ও দুঃখকষ্টের মধ্যে ফিরোজ শাহর মৃত্যু হল। মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা

ভারত সরকারের কাছে কিন্তু অর্থসাহায্য চেয়ে আবেদন করেছিলেন। তার ফল কী হয়েছিল সেকথা প্রথমেই বলেছি।

কলকাতার পুরনো হোটেল

মুখুজ্জেমশায় সেকালের ঝানু গোয়েন্দা পুলিশ। প্রায় দেড়শো বছর আগেকার কথা। তখন তো কলকাতার বাইরে হোটেল কিংবা থাকবার জায়গা বিশেষ ছিল না। লোকজনের যাওয়া-আসাও এত ছিল না। তাহলেও যাঁরা সরকারি চাকরি করতেন তাঁদের তো ঘুরে বেড়াতেই হত। থাকবার খাওয়ার ব্যবস্থা নিজেদেরই যথাসম্ভব করে নিতে হত, আরও কিছু বছর আগে কয়েক মাইল পরে-পরে চটি পাওয়া যেত, চটিতে থাকবার অনেক অসুবিধা ছিল। কোথাও কোথাও চটিদারের সঙ্গে ডাকাতদের ব্যবস্থা ছিল। সে-রকম চটিতে টাকা-পয়সা প্রাণ কিছুই নিরাপদে থাকত না। ধরা যাক, মুখুজ্জেমশায় সরকারি কাজে বর্ধমান জেলায় গিয়েছেন ডাকাত ধরতে। বেশির ভাগ সময় যাঁরা মুখুজ্জেমশায়ের মতো কাজ করতেন তাঁদের সঙ্গে কখনও-কখনও একজন লোক থাকত। সে রান্নাবান্নার সময় সব গুছিয়ে দিত, ফাই-ফরমাশ খাটত এবং ডাকাত ধরবার সময় সাহায্য করত। ইচ্ছা করলে অনেক সময় মুদির দোকানে এক রাত্রি দু-রাত্রি থাকা যেত। চাল ডাল নুন তেল কাঠ মুদির কাছ থেকে কিনতে হত। মুদিরা রান্নার বাসনও ভাড়া দিত। যেসব জায়গায় বড় বড় জমিদার ছিলেন সেখানে অতিথিশালা থাকত। সেখানেও আশ্রয়

পাওয়া যেত, রান্না-করা খাবারও অন্দরমহল থেকে আসত, কখনও-কখনও দেবতার ভোগ। ব্রাহ্মণ অতিথি হলে একটু বাড়তি খাতির পাওয়া যেত।

ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় ইংরেজদের শাসন তখন ভালভাবে গেড়ে বসেছে। ইংরেজদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। যুদ্ধবিগ্রহের জন্য লোক দরকার, শাসনের কাজের জন্যও অনেক লোক দরকার। তাছাড়া অনেক ইংরেজ তখন এদেশে বসতি আরম্ভ করেছিলেন, ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। এত লোকের থাকবার ব্যবস্থা কী-রকম ছিল ? কলকাতায় কয়েকটি ভাল হোটেল ছিল। কলকাতার সবচেয়ে পুরনো হোটেল কী বলা মুশকিল, তবে অনেকদিন আগে কলকাতার দক্ষিণে ফলতা গ্রামে একটি ইংরেজি ধরনের হোটেল ছিল। এখানে হোটেল করবার অর্থ স্পষ্ট। তখন ইয়োরোপ থেকে অনেক জাহাজ ফলতায় এসে থামত। জাহাজের যাত্রীরা অনেক সময় ফলতায় রাত্রিটা কাটিয়ে যেতেন। বিশপ হিবার নামে একজন নামকরা পাদ্রি লর্ড আমহার্স্টের সময় এ-দেশে বেড়াতে এসেছিলেন। তিনি এ-হোটেলে থাকেননি। তাহলে এই হোটেলের ভাল বর্ণনা পাওয়া যেত। তিনি শুধু বলেছেন, এটি ইংরেজি ধরনের হোটেল। এছাড়া বিশেষ কিছু জানা তাঁর সম্ভব হয়নি। এই হোটেল কতদিন টিকেছিল তাও জানবার উপায় নেই।

বোধহয়, কলকাতার সবচেয়ে পুরনো হোটেল যা কয়েক বছর আগে পর্যন্ত টিকে ছিল তার নাম স্পেনসেস হোটেল।. স্পেনসেস হোটেল রাজভবনের খুব কাছে। রাজভবনের উত্তর দেউড়ি থেকে সোজা বড় রাস্তা আগেকার ট্যাঙ্ক স্কোয়ার, পরের ডালহৌসি স্কোয়ার এবং বর্তমান বি বা দী বাগ পর্যন্ত চলে গিয়েছে। রাজভবনের দরজা থেকে চার-পাঁচ মিনিট হাঁটলেই রাস্তার বাঁ দিকে হোটেলের বড় বাড়ি। এখন দরজা বন্ধ, রাস্তার দিকে খানিকটা জায়গা টিন দিয়ে ঘেরা রয়েছে। এখানকার খাবারদাবার বেশ পুরনো, ইংরেজদের

খাবারদাবারের মতো। শেষের দিকে দেখলে মনে হত, হোটেলটার অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তারপর একদিন কর্মচারীদের ধর্মঘটের ফলে দরজা বন্ধ হয়ে গেল, আর খোলেনি। বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাস করে আসবার পরে মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই হোটেলে এসে উঠেছিলেন এবং কিছুদিন থেকেওছিলেন। আর একজনের কথা বলা যায়, তাঁকে অবশ্য খুব বেশি লোক জানতেন না। তিনি হব্‌সসাহেব। এক সময় সেনাবিভাগে চাকরি করতেন, পরে অবসর নিয়ে ডালহৌসি স্কোয়ারে একটি বাদ্যযন্ত্রের দোকান করেছিলেন। পুরনো কলকাতার উপর হব্‌সসাহেবের কয়েকটি বই আছে। বইগুলি সুখপাঠ্য। হব্‌সসাহেব বছর-পনেরো আগে মারা গিয়েছেন। তাঁকে অনেকে দেখেছেন, সন্ধ্যাবেলায় চৌরঙ্গি-পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে চৌরঙ্গির দিকে তাকিয়ে আছেন, লোকের আসা-যাওয়া দেখছেন।

আর একটি পুরনো হোটেল উইলসনসাহেবের হোটেল। এই শতাব্দীতে তার নাম বদলে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল হয়েছে। আর একটি হোটেল ছিল তার নাম ভুলে গিয়েছি, পুরনো কাগজপত্র থেকে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। সিপাহিযুদ্ধের সময় এই হোটেলটির কথা পুরনো ইলাসট্রেটেড লণ্ডন নিউজ-এ দেখা যেত। হোটেলটি ধর্মতলা স্ট্রিটে (এখনকার লেনিন সরণি) রাস্তার দিকে ছিল। পুরনো কাগজের বর্ণনা পড়ে আমার অনুমান, এখন যেখানে ওয়াছেল মোল্লার দোকান তার খুব কাছে হতে পারে। হোটেলটি বেশি দিন চলেনি। বোধহয় এই শতাব্দীর প্রথম দিকেই তার অস্তিত্ব ছিল না। শনি-রবিবার একটু শান্তিতে কাটাতে হলে আগেকার ইংরেজরা চন্দননগরে যেতেন। সেখানে অন্তত দুটি চলনসই কিম্বা ভাল হোটেল ছিল। চন্দননগর তো অনেকদিন পর্যন্ত ফরাসি রাজ্যে ছিল। ফরাসিদের রাজনৈতিক ক্ষমতা লর্ড ক্লাইভ আসবার পরেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু চন্দননগরে গেলে মনে হত ইংরেজ-শাসনের বাইরে অন্য পরিবেশ।

সেদিন পর্যন্ত চন্দননগরের উপর ফরাসিদের প্রভাব একেবারে লোপ পেয়ে যায়নি।

এইসব হোটেলে থাকা বড়লোক ছাড়া কারুর পক্ষে সম্ভব হত না। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে বড় হোটেলের থাকা-খাওয়ার খরচ ছিল দিনে দশ-বারো টাকা। তখনকার দিনে অবশ্য দশ টাকা অনেক টাকা। যেসব অল্পবয়সী ইংরেজ চাকরি নিয়ে এদেশে আসত তাদের নিজেদের মাইনে থেকে এ-টাকা দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাদের অবশ্য টাকা পাওয়ার অনেক উপায় ছিল। জাহাজ ঘাটে দাঁড়ালে যারা ভিড় করে আসত তাদের মধ্যে অনেকের উদ্দেশ্য ছিল নতুন লোকদের কাছে চাকরি যোগাড় করে নেওয়া। আর আসতেন সরকাররা। তাঁরা ইংরেজদের টাকা ধার দিয়ে, বাড়ির আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করে দিয়ে গুছিয়ে বসাতেন। বাড়তি টাকা তাঁরাই সুদে ধার দিতেন। তাঁদের টাকা বিশেষ মারা গিয়েছে বলে শুনিনি।

সাধারণ সৈন্যরা অবশ্য ফোর্ট উইলিয়মের ভিতরে ব্যারাকে থাকত। পরে ব্যারাকপুরে যখন ইংরেজদের ছাউনি হল তখনও অনেক সৈন্য সেখানে থাকত। কিন্তু যারা কেরানি হয়ে আসত, পরে অবশ্য দু-একজন গভর্নর-জেনারেল পর্যন্ত হয়েছেন, তাদের অনেক অসুবিধা ছিল। ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের পুব দিকে কয়েকটি গলি ছিল, এখনও আছে। সেসব জায়গায় পানাহারের ব্যবস্থা ছিল। গলিগুলোর বিশেষ সুনাম ছিল না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইচ্ছা ছিল না যে তাদের অধীনে যারা কাজ করে তারা এইসব জায়গায় থাকে। যখন রাইটার্স বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে তখন সরকারের ইচ্ছা ছিল এইখানে কোম্পানির লোকজনরা বাস করবে, অফিসের কাজে ব্যবহার করা হবে না, কিন্তু থাকার জায়গার বদলে ঐটি কেরানিপাড়া হয়ে দাঁড়াল। একবার কেবল কিছুদিনের জন্য কোম্পানির লোকদের ওখানে থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। যাই হোক, যে-উদ্দেশ্যে বাড়ি করা হয়েছিল সে-উদ্দেশ্য কিছুদিনের জন্য হলেও পূর্ণ হয়েছিল।

পরবর্তী কালে আরও বড় হোটেল হয়েছে, যেমন, গ্র্যাণ্ড হোটেল। চৌরঙ্গি-ধর্মতলার মোড়ে ছিল ব্রিস্টল হোটেল। এটি প্রধানত রেস্তোরাঁ, কেবল দু-একটি থাকবার ঘর ছিল। এই সব হোটেলে না থেকেও রেস্তোরাঁয় খাওয়া যেত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে পর্যন্ত কোথাও লাঞ্চ খেতে দেড় টাকার বেশি খরচ পড়ত না। যত ইচ্ছা খাওয়া যেত। কোনো-কোনো রেস্তোরাঁয় কুড়ি-পঁচিশ পদের বেশি খাবার দিত। এত বেশি পদ একসঙ্গে খাওয়া সম্ভব নয়। খরচ কিন্তু সেই দেড় টাকা। ১৯৩৯-৪০ সালে দেড় টাকা কি খুব বেশি টাকা হল ? এত রকম খাবারের কথা ভাবলে সে-কথা বলতে ইচ্ছে করে না।

একটি অবিশ্বাস্য কথা বলি। যুদ্ধের সময় যখন কলকাতায় অনেক বিদেশী সৈন্যর ভিড় হয়েছিল তখন চৌরঙ্গির একটি বিখ্যাত রেস্তোরাঁ বিকালের কফি দিত। শুধু কফি নয়, তার সঙ্গে আবার এক প্লেট ছোট 'সসেজ'। সবসুদ্ধ দাম চার আনা। ভাবতে পারো ?

ভোজ কয় যাহারে

টাবলু আর টিয়া বিকেলে বন্ধুর জন্মদিনে পাশের বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিল। ফিরে এলে জিজ্ঞেস করলুম, "কী রে, কী-রকম খাওয়া-দাওয়া হল?" টাবলু বললে, "দারুণ। মাছের চপ, মাংসের কাটলেট, খুব ভাল কেক।" টিয়া বলল, "তা ছাড়া আইসক্রিমও ছিল। একেবারে বিলিতি ধরনের খাওয়া। আমি একেবারে দিশি খাওয়া পছন্দ করি না—শুধু লুচি, আলুর দম আর রসগোল্লা।"

এখনকার ছেলেমেয়েরা এইরকম খাওয়াই পছন্দ করে। তাদের মা-বাবারাও। এতে ঝামেলা অনেক কম। এখন অবশ্য বিয়ে-টিয়েতেও ঝঞ্ঝাট অনেক কমে গিয়েছে। সকালবেলা নতুনবাজারে গিয়ে মাছ কিনতে হয় না এবং হাজিসাহেবের দোকানে মাংসের অর্ডার দিতে হয় না। ছাতের উপর ভিয়েনও বসে না। আরও আগেকার দিনে অর্থাৎ শ-পাঁচেক বছর আগে নেমন্তন্নে ঘটা এত বেশি ছিল না। নেমন্তন্ন মানে গাঁ-সুদ্ধ লোক পরিশ্রম করছে এবং গাঁ-সুদ্ধ লোক নেমন্তন্ন খেতে আসছে। চণ্ডীপুরাণ বলে একটি গ্রন্থ আছে, প্রায় এই সময় লেখা। তাতে খুল্লনা বলে একজন মহিলার রান্নার কথা আছে। খুল্লনার অবস্থা তখন খুব খারাপ ছিল। কিন্তু তিনি যা রান্না করেছিলেন তা আজকালের দিন হলে অন্তত

পঞ্চাশজন রান্নার লোকের দরকার। আর রান্না অন্তত একশো রকমের। তার মধ্যে নিরামিষ আছে, মাছ আছে, মাংস আছে। নানারকম পিঠে-পায়েস আছে। যাঁরা খেয়েছিলেন তাঁদেরও খাওয়ার বহর নিশ্চই খুব ছিল।

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনীতে যেসব খাওয়ার কথা আছে সেও টাবলুর কথায় 'দারুণ'। তবে বৈষ্ণবদের রান্না সবই নিরামিষ। চৈতন্যচরিতামৃত বইয়ে এইরকম একটি ভোজে কী কী রান্না হয়েছিল তার ফর্দ দিচ্ছি, তাও পুরো নয়, দিলে অনেক জায়গা লেগে যেত। শাক, মুগের ডাল, ভাতে একটু বেশি করে ঘি, পটল, বড়ি ও অন্যান্য সবজি দিয়ে তরকারি, কচি নিমপাতা ভাজা, বেগুন, ফুলবড়ি, মোচার ঘণ্ট, নারকেল, ঘন করে জাল দেওয়া দুধ, পায়েস, চাঁপাকলা, দই, দুধ দিয়ে চিড়ে ও আরও অনেক রকম। এসব রান্নায় আলুর কথা নেই, আলুর ব্যবহার তখনও জানা ছিল না। আলু যখন প্রথম দেখা দিল তখনও দেবতার ভোগে দেওয়া চলত না। রসুন-পেঁয়াজের কথা তো ভাবাই যায় না। বাংলার বাইরে অনেক জায়গায় রসুন খাওয়ার বাধা ছিল না। যাঁরা খুব গোঁড়া তাঁরাও রসুন খেতেন।

মধ্যযুগ থেকে ভারতবর্ষে সাধারণ লোকে মাংস খেতে শিখেছিলেন বললে ভুল হবে না। রাজা-রাজড়ারা বরাবরই খেতেন। অশোক তো শেষ পর্যন্ত মাংস খাওয়া ছাড়তে পারেননি। শিবাজির যখন খুব ধুমধাম করে রায়গড় দুর্গে অভিষেক হল, তখন সেখানে একদল ইংরেজ কাজে এসেছিলেন। অভিষেকের সময় তো সব ছুটি, কাজেই তাঁদের কয়েকদিন থেকে যেতে হল। তাঁরা অভিষেকের ধুমধামের ভাল বর্ণনা দিয়েছেন। কেবল তাঁদের দুঃখের কারণ যে-কদিন তাঁরা সেখানে ছিলেন দু'বেলা পাঁঠার মাংস খেতে হয়েছিল। তার সঙ্গে রোজ খিচুড়ি। শিবাজির রাজ্যে অন্য মাংস খাওয়া নিষেধ।

শিবাজির মৃত্যুর সাতাশ বছর পরে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হল।

কয়েক বছরের মধ্যে বিদেশী বণিকরা, যেমন পোর্তুগিজ, ইংরাজ, ফরাসি ও ওলন্দাজরা এদেশের সঙ্গে ব্যবসা জমিয়ে তুলল। তখন তো তাড়াতাড়ি ইউরোপে ফিরবার উপায় ছিল না। সাত-আট মাসের মধ্যে দেশে পৌঁছলে তো খুব ভাগ্যের কথা ; অনেক সময় আরও চার-পাঁচ মাস বেশি লেগে যেত। তার কারণ পথে ঝড়-বৃষ্টি কিংবা বোম্বেটের উৎপাত। তাছাড়া বিদেশী বণিকদের নিজেদের মধ্যে সুবিধা পেলেই ঝগড়াঝাটি হত। প্রথম প্রথম কোম্পানির যেসব বড়সাহেবরা আসতেন তাঁদের পক্ষে কয়েক বছরের মধ্যে দেশে ফেরা অসম্ভব ছিল। তাঁরা এদেশে কয়েক বছর থাকবার পরে নিজেদের আঁটোসাঁটো পোশাকের বদলে অনেক সময় এদেশের মতো ঢিলে পোশাক পরা পছন্দ করতেন। খাবার-দাবার ও এদেশের রান্না অল্প অল্প পছন্দ করতে আরম্ভ করেছিলেন। সেইসময় ইংরাজরা অনেক বেশি খেতেন। এত খেতেন যে বুড়ো বয়স অবধি সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব হত না। ইংরাজরা বলতেন এই দেশের জলবায়ু এত খারাপ যে তিন বছরের বেশি বাঁচাই মুশকিল। তখন বর্ষাকালে নানারকম অসুখবিসুখ করত। বর্ষার শেষে মোটামুটি হিসাব করে দেখা হত মোট কতজন মারা গিয়েছে। ট্যাঙ্ক স্কোয়ার অর্থাৎ এখনকার বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগের কাছে ইংরাজদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল ছিল। তার আছেই কবরখানা। দুষ্টু লোকে বলত খুব সুবিধা, বেশিক্ষণ মড়া বইবার দরকার হয় না। এইজন্য এক নম্বর গারস্টিন প্লেসের বাড়ি নিয়ে অনেক ভূতের গল্প আছে। বাড়িটি একেবারে সেই কবরখানার পাশে। এই বাড়ির তেতলায় খানিকটা খোলা ছাদ আছে। সেই ছাদের পাশে একটা বড় গাছ। গরমের দিনে জ্যোৎস্নারাতে দক্ষিণের বাতাস। এর চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে ? কিন্তু সেখানে ভাল করে বসবার উপায় নেই। কিছুক্ষণ বসলেই কে যেন কানে ফিসফিস করে বলত, সরে বোসো, সরে বোসো—অর্থাৎ যেখানে তুমি বসে আছ সেইটিই কারুর কবর।

জেনে রাখা ভাল যে, অনেক ভূতের মতো এই ভূতেরও কোনো অস্তিত্ব নেই।

বিলেতে রাজা অষ্টম হেনরি কিংবা রানী এলিজাবেথের সময় খাওয়া-দাওয়ার বেশ বাড়াবাড়ি ছিল। বড় ভোজ হলেই আস্ত ঝলসানো ষাঁড় কিংবা শুয়োর খাবার ঘরে নিয়ে আসা হত। মুরগির কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি। তখনও ইংল্যাণ্ডে ছুরি-কাঁটার চল হয়নি। প্রত্যেকের পোশাকের সঙ্গে একটা ছোট ছুরি থাকত। সেই ছুরি দিয়ে দরকারমতো মাংস কেটে খাওয়া হত। গরিবরা অবশ্য মাংস-টাংস বিশেষ খেতে পেত না। তাদের অবস্থা আমাদের দেশেও যা ওদের দেশেও সেইরকম ছিল।

প্রথম যখন বিদেশীরা এদেশে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন, তাঁরা কী ধরনের খাবার পছন্দ করতেন তার কথা বলছি। প্রথম বিদেশী যাঁরা এদেশে এসেছিলেন তাঁরা পোর্তুগিজ। তাঁদের আধিপত্য ছিল সুরাট অঞ্চলে। তখন চা খাওয়ার চলন আরম্ভ হয়নি। তাঁরা সকালে উঠে চায়ের বদলে যা খেতেন তাকে বলা হত **burnt wine**, অর্থাৎ একরকম মদের সঙ্গে নানারকম মশলা মিশিয়ে গরম করে খাওয়া হত। ব্রেকফাস্টে তিন-চার রকমের রান্না মাংস; দিশি খাবারও তাঁরা খেতে আরম্ভ করেছিলেন। তাঁদের মেনুতে কোপ্তা, কারি ও পোলাওয়ের কথা পাওয়া যায়। ডাচ বা ওলন্দাজরা বড় সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারেননি কিন্তু তাঁদের খাবার পরিমাণ বোধহয় সবচেয়ে বেশি ছিল। তাঁরা এত খেতেন যে খাওয়ার পর কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে না নিলে তাঁদের কাজ করবার অবস্থা থাকত না। তাঁদের সব রান্নাই একটু ভারী ধরনের ছিল। আমাদের মতো লোকের পক্ষে হজম করা কঠিন। সিঙ্গাপুরে কয়েকটি নামকরা হোটেল আছে। তারা সপ্তাহে একদিন দুপুরে ডাচ খাবার দেয়—**RIJSTAFFEL** অর্থাৎ 'রাইস টেব্‌ল'। তার অল্প একটু খেলেও আমাদের রাত্রে খাবার দরকার হবে না। ফরাসিদের খাবার

একটু বাবু ধরনের। লোকে বলে ইউরোপীয় রান্নার মধ্যে ফরাসিদের রান্নাই সবচেয়ে ভাল। তারাই প্রথম আইসক্রিম বানাতে শিখেছিল। ইংরাজদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সবচেয়ে ভাল কাজেই তাদের কথা একটু বেশি বলা যায়। ভাল রান্না করতে পারে না বলে ইংরাজদের একটা দুর্নাম আছে। কথাটা এক হিসেবে ঠিক। কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাঙালি ছাত্ররা ল্যাণ্ডলেডির বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করত।

ল্যাণ্ডলেডির খাবার প্রায় সব জায়গায় খুব খারাপ। আমরা সবাই জানি ডিমসেদ্ধর মতো সহজ কাজ আর কিছুই নেই। গরম জলে ফেলে দিলেই হল। কিন্তু এই সহজ কাজকেই তারা বলত, 'Shall I cook an egg for you?' ডিমসেদ্ধকে রান্না বলা শুনে আমার খুব হাসি পেয়েছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে ইংল্যাণ্ডের রান্না বদলে গিয়েছে। আমি যখন যুদ্ধের আগে ছাত্র ছিলাম তখন আলুভাজা দুষ্প্রাপ্য ছিল। আলু মানেই সিদ্ধ আলু কিংবা যাকে ওরা ম্যাসড পোট্যাটো (mashed potato) বলে, অর্থৎ আলু চটকে তাতে একটু মাখন দেওয়া। আমাদের যখন আলুভাজার জন্য মন আইঢাই করত তখন আমরা Lyons Tea Room-এ মাছভাজা খেতে যেতাম। মাছভাজার সঙ্গে একটু আলুভাজা দিত। যুদ্ধের কয়েক বছর পরে লণ্ডনে গেলাম। তখন উত্তর লণ্ডনে এক খবরের কাগজে একটি চিঠিতে দেখি একজন বাস কণ্ডাক্টর দুঃখ করে লিখেছে, এই পোড়া দেশে আলুসেদ্ধ খাবার উপায় নেই। আলুভাজা খেয়ে খেয়ে তার পেটে 'আলসার' হয়ে গেছে।

পুরনো দিনের ইংরাজ যাঁরা আমাদের দেশে এসেছিলেন তাঁদের খাবারের কথা বলছি। ইংরাজরা আপিস যাবার আগে ব্রেকফাস্ট খেতে বসে অন্তত দশ-বারো পদ খেতেন। তার পর তাঞ্জাম কি গাড়ি করে আপিসে রওনা হতেন। আপিস তিন ঘণ্টার বেশি হত না। পরে বাড়ি ফিরে এসে নিদ্রা। গরমের সময় আর কিছু করার উপায়

ছিল না। তখনকার প্রধান খাওয়া দুপুরে কিংবা বিকালের দিকে হত। দুপুরে তাঁরা কী খেতেন ? আমি একটি গরিব পরিবারের কথা বলছি। সেইসময় কলকাতায় মিসেস ফে বলে একজন ভদ্রমহিলা থাকতেন। তাঁর স্বামী কিছুদিন আগে মারা গিয়েছিলেন। মিসেস ফে'র একটি ছোট দোকান ছিল। তিনি লিখেছেন যে, সবাই বলে বাংলা দেশের গরমে খেতে রুচি হয় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি তার কোনো প্রমাণ পাননি। মিসেস ফে নিজেকে সবসময় ইনভ্যালিড অর্থাৎ প্রায় অসুস্থ বলতেন। এই 'অসুস্থ' মহিলাটি দুপুরবেলায় কী খেতেন ? ফর্দ এই রকম—স্যুপ, রোস্টকরা মুরগি, কারি-রাইস, মাটন-পাই, ভেড়ার সামনের পায়ের এক অংশ, রাইস-পুডিং, কয়েক রকম মিষ্টান্ন, খুব ভাল পনির, তার সঙ্গে রুটি এবং মাখন। শ্রীমতী ফে অসুস্থ ছিলেন বলে এই খাবার খেতেন, সুস্থ হলে কী খেতেন সেকথা লেখেননি। এর অনেক পরে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় নামে একজন নামকরা সাহিত্যিক ইউরোপে গিয়েছিলেন। তিনি যে খাবার ফর্দ দিয়েছেন সে আরও মারাত্মক।

এই দুপুরে খাবারই শেষ নয়। রাত্রে যাকে 'সাপার' বলা হত সেও প্রায় দুপুরের খাবারের মতো। এই খাবার খেয়েও ইংরাজরা যে অনেকে দু-তিন বছরের বেশি বাঁচতেন সেটাই আশ্চর্য। এখন এসব কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু এ ধরনের খাওয়া গত বিশ্বযুদ্ধের আগে এবং যুদ্ধের শেষে আমরা কলকাতাতেই দেখেছি। কলকাতায় তখন চারটে বড় হোটেল—সবচেয়ে পুরনো হল স্পেনসেস, গ্রেট ইস্টার্ন, ফারপো, পেলিটি। 'স্পেনসেস' ছাড়া বাকি তিনটি হোটেলে যে লাঞ্চ দেওয়া হত সেও অন্তত তিরিশ রকমের। সবাই অবশ্য সব জিনিস খেতে পারতেন না, ঐ থেকে বেছে নিতেন। সব খেলেও হোটেলওলাদের আপত্তি ছিল না। গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে আমি এক ভদ্রলোককে দেখেছি, তিনি খেয়েদেয়েপরিতৃপ্ত হয়ে একটি বাক্সে কিছু খাবার বাড়ি নিয়ে যেতেন, কেউ কিছু বলত না। লাঞ্চ খেতে খরচ

পড়ত দেড় টাকা। এখন কি কারুর বিশ্বাস হবে ? যুদ্ধের সময় নানারকম কড়াকড়ি হল, নিয়ম হল তিন কোর্সের বেশি কেউ খেতে পারবে না। তার মানে পৃথিবীতে আর আনন্দ করার কিছু থাকল না।

মধ্যযুগে যখন ক্রুসেড আরম্ভ হল তখনই ইংল্যাণ্ডের খাবার-দাবার, জামা-কাপড় কিছু বদলে গিয়েছিল। ইউরোপের দক্ষিণে অনেকাংশ মুসলমানদের অধিকারে ছিল। তখন সেখানে মশলা ও রসুনের ব্যবহার খুব বেশি হতে আরম্ভ হয়। কয়েক বছর আগে আমি সেসব জায়গায় গিয়েছি, ড্যানিয়ুব নদীর কাছে। খেয়ে মনে হল কোনো কোনো রান্নায় বড় বেশি রসুন। আমরা তো সবাই রসুন খাই, কিন্তু অত বেশি খাই না।

এত সব খাবার কথা শুনে টাবলু বললে, "আমাদেরও তো এইসব খেলে বেশ হয়।" টিয়া বললে, "সে কী করে হবে! মা কি এতরকম রান্না করতে জানে!" টাবলু বললে, "তাহলে মামিমাকে লিখে দিই।" টাবলুর মামিমা বিদেশে থাকেন। টিয়া বলল, "তুই ইংরিজিতে সব গুছিয়ে লিখতে পারবি তো ?" মামিমা আবার ভাল বাংলা বলতে পারেন না। টাবলু অনেকক্ষণ ভাবতে লাগল আর টিয়া বুড়ো আঙুল চুষতে লাগল। টাবলু এবার টিয়াকে বলল, "দাদুর নাম করে বললে কিছু হবে ?" টিয়া বলল, "তোর যা বুদ্ধি, মা দাদুকে ভাল করে খেতেই দেয় না, সবসময় বলে এটা খেও না, ওটা খেও না, তুমি বুড়ো হয়েছ, অসুখ করবে। তার চাইতে মাকে গিয়ে বলি কালকে আমাদের জন্য মাছের কচুরি কোরো, তার সঙ্গে একটু আমের চাটনি দিও, তাহলে কী রকম হয় রে ?" টাবলু বলল, "দা-রু-ণ।"

জন্ম : ১৯১০ । পিতা— অতুলচন্দ্র গুপ্ত । ইতিহাসে অনার্স নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি এ ও এম এ । পি-এইচ ডি লন্ডনে ।
অধ্যাপনা করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৩৯-৬১) । ১৯৬১-তে যাদবপুরে ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক । অল্পকালের জন্য উপাচার্যও । উপাচার্য ছিলেন বিশ্বভারতীর (১৯৭০-৭৫) ও রবীন্দ্রভারতীর (১৯৭৫-৭৯) । ১৯৭৫-এ 'পদ্মভূষণ' । ১৯৮১-৮৩ : এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ।

রাজা-বাদশার নামের ফর্দ নয়, নয় সাল-তারিখের কচকচি, মানুষের ধারাবাহিক জীবনযাত্রার চলমান প্রতিচ্ছবির নামই ইতিহাস । সত্য যে গল্প-উপন্যাসের থেকেও বেশি বিস্ময়কর, কবি বায়রনের এ-উক্তি সমর্থন ইতিহাসের পৃষ্ঠাতেই নিহিত ।
ইতিহাসের পৃষ্ঠা হাতড়ে এমনই কিছু কৌতূহলকর সত্য উদ্ধার করে ছোটদের জন্য উপহার সাজিয়েছেন ঐতিহাসিক প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত । গল্পের থেকেও ঢের বেশি আকর্ষণীয় এইসব কাহিনী ।
কেমন ছিল তিন শ বছর আগের কলকাতা, কীভাবে গড়ে উঠল নতুন কলকাতা, কার উৎসাহে তৈরি হল লাটপ্রাসাদ— এ-সব কথা গল্পচ্ছলে যেমন শুনিয়েছেন তিনি, সেইসঙ্গে শুনিয়েছেন কলকাতার হোটেল আর বিভিন্ন যুগের খাদ্যরুচির বিচিত্র বৃত্তান্ত । যেমন তুলে ধরেছেন পর্যটক মানুচি কিংবা মোগল-দরবারে ইংরেজ ডাক্তার অথবা হেস্টিংসের বন্ধু পলিয়ের-এর অজানা কাহিনী, তেমনি তাঁর অন্যতম প্রিয় বিষয় মহারাষ্ট্রের ইতিহাস থেকেও শোনাতে ভোলেননি একগুচ্ছ আকর্ষণীয় গল্প ।
ছোটদের চাহিদা-মেটানোর তালিকায় এক অমূল্য সংযোজন 'ইতিহাসের গল্প' ।

ISBN 81-7066-004-1